তরঙ্গহীন

আশাপূর্ণা দেবী

সাহিত্য সংস্থা

সাহিত্য সংস্থা

প্রথম প্রকাশ

বৈশাখ—১৩৪৯

প্রকাশক
রণধীর পাল
সাহিত্য সংস্থা
৯, নবীন পাল লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রক
সুধীর পাল
সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১১৪/১-এ, রাজা রামমোহন সরণি
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ
অর্ধেন্দু রায়

প্রাপ্তিস্থান
সুহাস পাবলিশিং হাউস

ক পাঠিয়ে দিয়েছিলেন টিকিটের জন্যে, আর বলেছিলেন
ওয়াটা গোপনীয় এবং বিশেষ জরুরী।

স্তনকে ওর বেশী বলা যায় না।

। যায় না, 'এই যাওয়াটা আমার সরকারের দরকারে নয়, দরকারে।'

ধরে নিয়েছে সরকারী কাজেই চললেন সেনসাহেব। বিভাও
ঝছে।

তবু বিভা ভুরু কুঁচকে বলেছিল, 'আজ না ডাক্তার বোসের আসার কথা?'

'আসবে, তোমার কাছে কফি খাবে, আড্ডা দেবে।'

অভ্যস্ত ধরনেই বলেছিলেন সুরথ সেন, কিন্তু সুরটা যেন ঘষা লেগেছিল।

বিভা বলেছিল, 'কী এমন জরুরী তলব এল বুঝছি
তো। কলকাতার আবহাওয়া সম্পর্কে একটু সচে
আমাদের মত টপম্যানদের ওপরই তো যত লোকের
ানটা বেশ জেনুইন মনে হয়েছিল?'

সুরথ সেন বলেছিলেন, 'কী যে বল!'

এছাড়া কী বলবেন?

বিভাকে কি বলতে পারা সম্ভব ছিল ফোন-টোন
খানা চিঠি মাত্র। অফিসের ঠিকানায় আসা একখানা
যার স্ট্যাম্পের উপর হাওড়া জেলার একটি অখ্যাত

ব ভিতরের চিঠির মাথায় অবশ্য বেশ স্পষ্ট করেই
—শ্রীসোমেন মজুমদার। গ্রাম : শীতলপুর,
জেলা : হাওড়া।

টা দেখলে বিভা হয়তো হেসে খুন হতো।

না জামার পকেটে রাখেন নি সেনসাহেব, অ্যাটাচিতেও

না, জানতেন ওগুলোতেও বিভার হাত পড়বে। পড়বে না
পকেটে, কারণ সেটা বদলাবার সময় ছিল না তো। পরাই

চিঠিটা সেইখানেই আছে, শরীরের খানিকটা অংশে যেন জ্বলন্ত কয়লা চেপে ধরে বসে আছে।

এই গাড়ির কামরায় আর সবাই যখন ঘুমন্ত, তখন জে থাকাটা কষ্টকর, আরো কষ্টকর লাগছে ওই জ্বলন্ত অনুভূতিটা।

অনেকবার ইচ্ছে হচ্ছে একবার বার করে নিয়ে আর নিখুঁত করে পড়েন। মনে হচ্ছে সম্পূর্ণটা যেন পড়া হয় নি। যখন পড়েছেন তখন মনে হয়েছে পৃথিবীর সব চোখ যেন ওই চিঠিটার ওপর এসে হুমড়ে পড়তে চাইছে।

সেনসাহেবের মত মান্যগণ্য একজন মানুষ পোঃ শীতলপুর, লপুর, জেলা হাওড়ার চিঠি পড়ছেন, এটা প্রচার হয়ে যাওয়াটা ড় ভয়ানক লজ্জার।

সুরথ সেন নামের প্রতিষ্ঠাপন্ন ব্যক্তিটি জানেনই না ওই জায়গাটা য় হতে পারে, কোথায় হওয়া সম্ভব অথচ ওই ঠিকানাটা বার কববার জন্যেই তাঁর আজকের এই যাত্রা। নিঃসঙ্গ যাত্রা।

নেশ বলেছিল, 'শরীর ভাল নয়, ট্রেনে যাচ্ছেন, সঙ্গে একজন হত না স্যর? আমার ছুটিটা করিয়ে নিলেই—'

রথ বলেছিলেন, 'দরকার নেই।'

নশ যদিও অর্ডারলি নয়, কর্নিষ্ঠতম কেরানী একজন, কিন্তু মহত্বে' সে ওপরওলাদের অর্ডারলি কেন, জুতো ঝাড়া স্তুত হতে পারে। ওনাদের দরকারের সময় সামনে এগিয়েই নেশ।

ওই সেবার হস্তখানি সেনসাহেব যে কখনো-সখনো তা নয়, তবে আজ করলেন না। বললেন, 'থাক।'

তবু নাছোড়বান্দা দীনেশ টিকেট কাটার টাকাটা চেয়ে অফিস ছুটি করে বেরিয়ে এসেছিল।

...উকে কি সঙ্গে নিলে হতো।

...ম না হওয়া চঞ্চল মাথায় কথাটা একবার ভাবলেন সুরথ, ওই ...টকেল জায়গা, কী জাতি কী পরিস্থিতিতে পড়তে হবে, জানি ...রকম রাস্তা-টাস্তা—তাছাড়া বিভার সেই কথাটা এখন মাথার ...যেন বেরিয়ে যাবার রাস্তা না পেয়ে এঘর ওঘর ঘুরে বেড়াচ্ছে, ... জেনুইন তো ?'

ফোন না হোক, চিঠিটাই বা কী ?

কে বলতে পারে ব্ল্যাক-মেলিংয়ের এ একটা নতুন পদ্ধতি কি না।

সোমেন মজুমদার নামের লোকটার পক্ষে কী এটা অসম্ভব ?

লোকটা কী খুব চরিত্রবান ?

অথচ বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন সুরথ সেন নামের ব্যক্তিটি, সরকারের একটি বিশেষ কর্মকেন্দ্রের যিনি বুদ্ধিদাতা, তিনি কি না ওই লোকটার একখানা চিঠি পেয়েই জ্ঞান-গম্যি হারিয়ে ছুটে বেরিয়ে এলেন নিরাপদ আশ্রয়, আরামের গৃহগণ্ডি থেকে !

প্রায় পাগলের মতই কাজটা হল নাকি ?

সোমেন নামের বদ চরিত্রের লোকটা হঠাৎ বহুদিনের বিস্মৃতির পর্দা সরিয়ে মুখ বাড়িয়ে একটা রূপকথার গল্প শোনাল, আর সুরথ সেই গল্প বিশ্বাস করে ছুটলেন তার কাছে ?

রূপকথাই তো !

রূপকথা ছাড়া আর কী ?

একমাত্র রূপকথাতেই থাকে মরা মানুষ বেঁচে উঠে কথা কয়, ভস্ম পুতুলের গায়ে মন্ত্রপুত বারি ছিটিয়ে দিলে সে আর পুতুল থাকে না ...য় যায়। আরো সব আজগুবি।

...মেন মজুমদার সেইরকম আজগুবি গল্পই খানিকটা শুনিয়েছে ..., সেই গল্পের শেষ শুনতে যাচ্ছেন সুরথ সেন।

...টা বার করে গল্পটা আর একবার যাচাই করবার চিন্তাটা ... হল না, আবার সেখানার ভাঁজ খুলে পৃথিবীর সামনে মেলে

ধরবার সাহস হল না, শুধু মনে মনে ভাবতে লাগলেন, লাইনের পর কোন লাইনটা কোন বক্তব্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আ

আশ্চর্য, একবারই তো পড়েছিলেন!

তবু সব লাইনগুলো চোখের সামনে ছবির মত দাঁড়িয়ে কী করে?

ছবি? তাছাড়া অন্য কোনো তুলনা মনে আসছে না। বন্দুক উঁচনো সৈন্যপুতুলের ছবি যেন।

হাতের লেখাটা কী করে এখনো ঠিক আগের মত সোমেনের, ভেবে অবাক লেগেছে সুরথের। সুরথেরও হয় তাই, কিন্তু সুরথের তেমনি সবই আছে। প্রতিষ্ঠা, প্রাতপত্তি, স্থিতাবস্থা, সাফল্য সার্থকতা।

কিন্তু ওই সোমেন মজুমদার নামের হতভাগাটা? গ্রাম শীতলপুর, পোঃ শীতলপুর, জেলা হাওড়ায় যার বাস, তার হাতের লেখাটা কী করে অবিকৃত থাকতে পারে? অথচ জীবনটা বিকৃত করে ফেলেছে।

সঙ্গীন উঁচানো সৈন্যগুলো কথা কয়ে উঠল—

"সুরথ,

কোন সম্বোধন দিয়ে চিঠিটা শুরু করব এটা ভাবতে ভাবতেই পুরো একটা দিন-রাত কেটে গেল তারপর ভেবে দেখলাম, আর দেরী করলে, হয়তো চিঠি লেখার দরকারটাই ফুরোবে।

জানি তোমার 'আপনি আজ্ঞে' শোনা কানে এই নাম ধরে ডাকা আর 'তুমি' সম্বোধনটা খট্ করে বাজবে, কিন্তু দোহাই তে রাগ করে মুচড়ে ফেলে না দিয়ে চিঠিটা পোড়ো। এতে আশ্চর্য কথা শোনাব।

সতেরো বছর আগে আর একটা চিঠি তোমায় লিখেছি বোধহয় মনে আছে? তাতে আমাকে সম্বোধনের জন্যে এত

ত হয়নি, কারণ তাতে শুধু দু-লাইনের একটা সংবাদ ছিল মাত্র। আচ্ছা ঠিক কী লিখেছিলাম বল তো? তোমার মনে আছে টা?

আমার ঠিক মনে পড়ছে না। বোধহয় লিখেছিলাম—'জয়া মারা ছে। সুখী শরীর, কষ্ট সইতে পারল না, দিন পাঁচেকের জ্বরে—কে দাহ করে এসে চিঠি লিখছি!'

একেবারে ঠিক ঠিক না হলেও এই রকমই হবে। তাতে 'তুমি আপনি'র প্রশ্ন ছিল না, অতীত বন্ধুত্বের দাবিতে নাম ধরে ডাকার দরকারও ছিল না।

কিন্তু এ চিঠিটা বড় করে লিখতে হচ্ছে, নৈর্ব্যক্তিক ভাষা চালানো শক্ত।

আচ্ছা—সতেরো বছর পরে আবার যদি বলি, 'জয়া মারা যেতে বসেছে?'

চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে দেবে?

কিন্তু কথাটা সত্যি।

জয়া মারা যেতে বসেছে! হয়তো আর দুটো-চারটে দিন, হয়তো তাও নয়, তবু তোমায় জানাচ্ছি। আর একটা ভয়ানক অবাস্তব প্রশ্ন করছি—ওর চোখ দুটো চিরকালের জন্যে বুজে যাবার আগে একবারের জন্যে ওর সামনে এসে দাঁড়াতে পারা যায় না?

সরকারী দপ্তরের অনেক দুরূহ কাজ তো করতে হয় তোমাকে, দুরূহ কাজ করার শক্তি কিছু অর্জন করেছ হয়তো, এই প্রত্যাশা নিয়েই বলছি।

মরবার মুহূর্ত গুণছে ও, বুঝতে পারছি পৃথিবীর জন্যে আর একবিন্দুও মোহ নেই ওর, তবু এও বুঝতে পারছি একটি পরম প্রত্যাশায় তাকিয়ে আছে পৃথিবীর দিকে—মরতেও পারছে না।

এ প্রত্যাশা আমিই জাগিয়ে দিয়েছিলাম ওর মনে, এ অপরাধ স্বীকার করছি।

আমি সব বুঝেও বোকার মত ওর মন বুঝতে চেয়েছিলাম, তাই মিছিমিছি করে বলেছিলাম, 'সুরথকে একটা চিঠি দিলাম।'

ভেবেছিলাম জয়া বুঝি খুব চমকে উঠবে, কিন্তু চমকে ও উঠল না। ও শুধু ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

আমার তখন নেশা চেপেছে, বললাম 'চিঠিতে সুরথের কাছে ক্ষমা চেয়েছি, তোমার মিথ্যে মৃত্যু-সংবাদ দেবার জন্যে।'

জয়া একটু হেসে বলল, 'মিথ্যে তো নয়।'

বললাম, 'পরোক্ষে কী জানি না। প্রত্যক্ষে তুমি এখনো পৃথিবীর আলো বাতাসের উপসত্ব ভোগ করছ। অতএব সতেরো বছর আগে সুরথ সেনের ঠিকানায় যে মৃত্যু-সংবাদটা পাঠানো হয়েছিল, সেটা মিথ্যে।'

জয়া বলল, 'তা বটে।'

আমি গোঁয়ারের মত আবার বললাম—'আরো লিখেছি জয়াকে একবার শেষ দেখা দেখতে আসা কী অসম্ভব?'

এবার ও চমকে উঠল। বলল, 'লিখেছ এই কথা?'

অম্লান বদনে বললাম, 'লিখলাম তো।'

জয়া রেগে উঠল না, রেগে ওঠার শক্তিও অবশ্য ওর নেই আর, অনেক দিনই নেই। ডাক্তার বলেছে ক্যান্সার রোগটা চিত্তের সব অনুভূতিকে আস্তে আস্তে স্তিমিত করে দেয়।

অবশ্য শীতলপুরের ডাক্তার। তার বুদ্ধি বিশ্বাস মতই কথা

তবে সত্যিই জয়ার সব কিছুই স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। গ্রামোন্নয়নের নেশা তখন মিলিয়ে গিয়েছিল, ঝরে গিয়েছিল চাষীদের ঘরে ঘরে ঘুরে তাদের মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর ইচ্ছে। ও যেন জীবনের বোঝাটা টেনে টেনে শুধু পরমায়ুর ঋণ শোধ করছিল।

তারপর তো রোগ ধরা পড়ল।

তা সেদিন জয়া রেগে উঠল না।

জয়া শুধু বলল, যদি সত্যি লিখে থাকো তো একেবারে নীরেট বোকার মত কাজটা হয়েছে।'

বলল, 'যদি সত্যি লিখে থাকো—'

তার মানে ও বিশ্বাস করছিল না।

তখন দুর্মতির ভূত আমায় কাজ করাচ্ছে, তাই বললাম, 'বোকার মত কাজই তো করে চলেছি সারাজীবন। এটা তারই একটা নতুন পরিচ্ছেদ।'

ও তখন হঠাৎ একটু কৌতুকের মত হেসে বলল, তাহলে কেষ্ট-বিষ্টু বন্ধুর জন্যে একটা সিংহাসন অর্ডার দাও। কখন না জানি তোমার কুটিরে এসে হাজির হন।'

দেখালো যেন খুব একখানা ঠাট্টা করল, কিন্তু আমি যা জানতে চেয়েছিলাম তা জেনে নিলাম।

দেখলাম ওর রোগবিবর্ণ মুখে হঠাৎ যেন লালচের ছোপ ধরেছে, ওর ক্লান্ত নিষ্প্রভ চোখ দুটোর কোণে হঠাৎ যেন আলোর ঝিলিক, আর ওর শান্ত হৃদয়ে যেন একটা অশান্ত প্রত্যাশা।

'কে আসিছে বলে চমকিয়া চাই, কাননে ডাকিলে পাখি—অনেকটা যেন এই রকম অবস্থা।

ঈর্ষা করা অনেক দিনই ছেড়ে দিয়েছিলাম, প্রত্যাশার পাত্রখানাও উপুড় করে ফেলে রেখেছিলাম এক পাশে, তবু ওর ওই উদ্ভ্রান্ত ভাব, ওর ওই চাঞ্চল্য আমাকে স্বস্তি দিচ্ছিল না।

রাগ হতো, অপমান হতো, পরাজিতের গ্লানি অনুভব করতাম

আর সত্যি বলব—আজ পাপ স্বীকার করতেই বসেছি—ক্রমশঃই যখন জয়ার মুখের সেই লালচে ছোপ মিলিয়ে গেল, চোখের আলো নিভে গেল, নীরব প্রতীক্ষার চাঞ্চল্য ঠাণ্ডা মেরে গেল, মনে মনে বেশ একটা উল্লাস অনুভব করলাম।

অনেকটা যেন, বোঝ কেমন সেই সুরথ সেন। অথচ ওর জন্যেই তুমি নিজেকেও বাঁচতে দিলে না, আমাকেও মারলে।

মানুষের মত নিষ্ঠুর আর হিংস্র জীব পৃথিবীতে বোধহয় আর দ্বিতীয় নেই, তাই না সুরথ?

নইলে যে মানুষটা তিল তিল করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তাকে হঠাৎ একটা ঘা মেরে সেই যাওয়াটা তরান্বিত করে বসলাম কেন?

কী লাভ হল আমার মিছে করে বলতে, সুরথকে একটা চিঠি দিলাম।

অবশ্য চিরকাল শুনে আসছি, 'রাখে কেষ্ট আর মারে কেষ্ট—'। তবু মনে হচ্ছে হয়তো আমিই ওকে তাড়াতাড়ি মারলাম। ওকে যদি ওই অবাস্তব একটা প্রত্যাশার পথ দেখিয়ে না দিতাম, ও হয়তো এত তাড়াতাড়ি নিভে যেত না।

আজ সত্যিই তোমায় চিঠি লিখছি, কিন্তু আজ আর ওকে বলিনি। নৃশংসতারও তো একটা সীমা আছে?

এখন ওর জন্যে ভারী একটা মমতা বোধ হচ্ছে বুঝলে? ইচ্ছে হচ্ছে চলে যাবার আগে যদি ও চোখের কোণে একটু আলো নিয়ে যেতে পারত!

কিন্তু আর একটা কথা বাকি আছে।

এটাও তো বলতে হবে—সতেরো বছর আগে একদিন সেই চিঠিটা লিখেছিলাম কেন? যাতে লিখেছিলাম জয়া মারা গেছে।

তার উত্তরে এইটুকুই বলি—সে চিঠিটা আমার ছিল না, আমি শুধু কপি করেছিলাম।

জয়ার নির্দেশে।

জয়ার কেন এ খেয়াল হয়েছিল জানিনা। ঘটা করে ক্ষমা-টমা চাইব না, শুধু এই টুকু বলেই বিদায় নিই, মহৎ হবার অথবা মহত্ব দেখাবার একটা সুখ আছে, সেই সুখটা চেখে দেখ না একবার।

ইতি

নির্লজ্জ সোমেন

কপালটা একটু কুচকে উঠল সুরথের, চিঠিটা পাবার সময়ও যেমন উঠেছিল।

বাহাদুরী করে আবার নিজেকে নির্লজ্জ বলা হয়েছে।

নির্লজ্জ তো বটেই। হয়তো জোচ্চোরও।

কে বলতে পারে এখন অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়েছে। কে বলতে পারে ফন্দি করে পয়সাগুলো একজনকে ধাপ্পা দিয়ে নিয়ে গিয়ে বিপদে-টিপদে ফেলে মোচড় দিয়ে টাকা আদায় করার মতলব কিনা।

চিন্তাটা দানা বাঁধল না।

সোমেন মজুমদার নামের একটা জঘন্য অপরাধে অপরাধী লোক সম্পর্কেও ওই টাকা আদায়ের ব্যাপারটা মিলাতে পারা গেল না।

ঘুম না হওয়া রাত যে রাতের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে অন্য এক ভয়াবহ রাত ঝাপিয়ে পড়বার জন্যে অপেক্ষা করছে।

সুরথ সেন পর্দা-ঢাকা কাঁচ বন্ধ জানালাটার দিকে তাকালেন আকাশ দেখতে পাবার কোনো প্রশ্ন নেই, তবু কেন তাকালেন কে জানে। ওঁর তাকানো চোখের ওপর যে ছবিটা আবছা হয়ে ভেসে উঠল সেটা এই কামরারই দৃশ্য।

সারি সারি গদি আটা আসনে ঘুমে ঢলে পড়া মানুষের সারি

সেন সাহেবের ভারত ছাড়িয়ে অনেক দেশ বিদেশ ঘুরে এসেছেন কাজের খাতিরে কোনোদিনই ভাবেন নি, কি করে পৌঁছব। আর হাওড়া জেলার এক শীতলপুর গ্রাম ওঁকে যেন দুর্গম দুস্তরের দুশ্চিন্তা এনে দিয়েছে।

যেন এই বাতানুকুল ট্রেনের কামরাখানা তাঁকে শেষ নিরা আশ্রয় দিয়ে রেখেছে, যেই এর থেকে নামবেন, একটা অজান গহ্বরের মধ্যে অসহায়ের মত আছড়ে পড়বেন। যেন তা থেকে উদ্ধার হতে পারবেন কিনা সন্দেহ।

অথচ কিছুই সময়সাপেক্ষ ব্যাপার নয়।

হাওড়া থেকে জিজ্ঞেসবাদ করে একটা ট্যাক্সী নিলেন সেনসাহেব। তারপর একটা সাইকেল রিক্সায় চেপে প্রশ্ন করতে করতে ঘোষাল বাড়ির ভাড়াটে সোমেন মজুমদারের বাসায়।

রিক্সাওয়ালাটাকেই ভিতরে খবর দেবার কাজে লাগালেন, তারপর একটা কাঠ ঠোকার মত খট খট খট আওয়াজ পেলেন।

এটা কিসের শব্দ।

লাঠি ঠুকে ঠুকে আসছে না কি কেউ?

বাড়িতে কি কোনো বুরো চাকর টাকর পুষেছে? না বাড়ি-ওয়ালার ব্যাপার?

মিনিট খানেক ধরে ভাবছেন।

মানে মিনিট খানেকই ভাববার জন্যে সময় পেলেন, তারপর শব্দটা ঘরের মধ্যে এসে ঢুকল, থামল।

স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকলেন সুরথ কে জানে ক' সেকেণ্ড, তারপর শুধু উচ্চারণ করলেন, 'সোমেন!'

সামনের জীর্ণ গেঞ্জীপরা শীর্ণদেহী লোকটাকে দেখে বোঝা গেল শব্দটা কিসের হচ্ছিল। এখন আর শব্দ হচ্ছে না, কারণ ওর বগলের ক্রাচ্ দুটো এখন শুধু ওকে দাঁড় করিয়ে রাখার কাজে স্থির হয়ে রয়েছে।

সেনসাহেবের ওই অস্ফুট নামোচ্চারণের উত্তরে ক্রাচ্ধারী লোকটা প্রায় হাসির গলায় বলে উঠল, 'হ্যাঁ, নির্লজ্জ সোমেন।'

গতকাল থেকে ট্রেনে ট্যাক্সীতে এবং সাইকেল-রিক্সায় সুরথ সেন নামের লোকটাকে, কে যেন একটা অসহায়তার জালে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, ওই নির্লজ্জ লোকটার স্পষ্ট গলার ধারালো অস্ত্রে সেই জালটা কি ছিঁড়ে গেল?

নইলে সুরথ সেনই বা হঠাৎ এমন জোড়ালো গলায় বলে উঠতে পারলেন কী করে, 'পা দুখানা খোওয়ালে কবে?'

'পা? ওঃ, সে তো অনেক দিন।'

কিসে গেল ? ট্রেনের চাকার তলায় পড়ে সুইসাইড করতে গিয়েছিলে ?

'সুইসাইড ? শীর্ণ মুখের পেশী প্রকট করে সোমেন হেসে ওঠে 'হঠাৎ আমাব সম্পর্কে এতটা উচ্চ ধারণা হল কী করে ? সুইসাইডটা তো বিবেক-টিবেক সম্পন্ন মানুষেব কাজ, শয়তানে কী সুইসাইড কবে ?'

'তা বটে !'

সুবথ সেন তীব্র ব্যঙ্গেব গলায় বলে ওঠেন, 'তাহলে বোধহয় আবাব কাবো ঘরে হাঁড়ি খেতে ঢুকেছিলে ? ঠেঙিয়ে ঠ্যাং দুটো গুড়িযে দিযেছে ?

গতকাল থেকে সাবাক্ষণ ভেবেছেন সুবথ সেন, কিছুতেই বোধহয় সহজ গল য় কথা বলা যাবে না, আব অনেকবার ভেবেছেন, কিন্তু কেন যাচ্ছি আমি ? ভেবেছেন ফিরে যাই। তাঁর নিজের দিক থেকে মানবিকতাব কোনো দায় নেই মনকে বলে বলে মুখস্থ করাচ্ছিলেন, আর একটা মূঢ়লোকের বিমূঢ় অবস্থা কল্পনা করে বিরক্ত হচ্ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য, বিমূঢ়ও হলেন না, অসহজও না। বহুদিন আগের গলায় অনায়াসে বলে উঠতে পারলেন, 'তাছাড়া আর কী হবে ?'

'তা প্রায় তাই।'

সোমেন হেসে ওঠে, 'অন্যের ঘরে হাঁড়ি খেতে না ঢুকলেও অন্যের ক্ষেতে পোকাব ওষুধ ছড়াতে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম অবোধ বেচারীরা জানে না, সব ধান পোকায় খেয়ে যাবে, ওদের বোঝানোর থেকে আমি নিজেই—তারপর এই প্রতিফল !'

'বাঃ! আজকাল তো দেখছি বেশ গল্প বানাতেও শিখেছ—।' সোমেন মৃদু হেসে বলে 'আমার বলা কথা গল্প মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু থাক ওকথা, আমার মত খাড়াই দাঁড়িয়ে থাকবে নাকি ? ভিতরে চল—'

সুরথ সেনের মুখটা হঠাৎ পাথরের মত শক্ত হয়ে ওঠে। আর পাথুরে গলাতেই বলেন, 'ভিতরে কেন ?

বাঃ, ভিতরে যাবে না ?'

'কারণ আছে কিছু ?'

সোমেন একটু তাকিয়ে বলে, 'তাহলে এলে কেন ?'

'এলাম কেন ?' আচমকা গর্জে ওঠেন সেনসাহেব, 'এলাম তোমায় গুলি করতে !'

'তাহলে সেটাই কর। এনেছ নাকি বন্দুক ? বার কর বাবা, বেঁচে যাই।'

'বেঁচে যাও ? ওঃ ! তবে ওটা এখন থাক। তোমাকে বাঁচাবার জন্যে মরছি না আমি।'

সোমেন মৃদু হেসে বলে, তাহলে তো আশাটা গেল। চল চল। বাইরের দিকের এই ঘরটা কমন। বাড়িওলারও কিছু শেয়ার আছে।

সুরথ সেন কড়া গলায় বলেন, 'ভিতরে কী আছে ?'

'কী আছে ? সেটাই তো বলা মুশকিল। তার থেকে যদি শুধোতে, কে আছে ? জবাব দেওয়া সহজ হতো।

'ওঃ, এখনো সেই কথার মার-প্যাঁচের অভ্যেসটি ষোল আনা আছে। ঠিক আছে, সেই সহজটাই করা হোক।'

সোমেন এবার গলা নামিয়ে আস্তে বলে, জয়া ছাড়া আর কে থাকবে ?'

'আছে ? নাকি মড়া জাগিয়ে রেখে সৎকারের কড়ির জন্যে আর্জিপত্র পাঠানো হয়েছিল ?'

সোমেনের ক্রাচ দুটো থেকে আবার শব্দ উঠছে। সোমেন খোলা দরজাটা দিয়ে ভিতরে ঢুকছে। সুরথও পিছনে পিছনে।

একটা প্যাসেজ পার হচ্ছেন ওঁরা।

শব্দটা একটু থামিয়ে সোমেন বলে, 'খুব ভুল বলনি। মড়াই আগলাচ্ছি। শুধু আজ বলে নয়, উনিশ বছর ধরে।'

'এটাও গল্প।' বললেন সুরথ সেন।

কিন্তু বলার মধ্যে তীব্রতা ফুটল না।

যন বিশ্বাস করলেন, আর সেই বিশ্বাসের মধ্যে কোনোখানে পায়ের তলায় একটু মাটি পেলেন। তবু বললেনও।

সোমেন উত্তর দিল না, একটু হাসল। তারপর প্যাসেজটার শেষ প্রান্তে এসে একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, 'নিজের চোখেই ছাখো।

পাড়াগাঁয়ের জরাজীর্ণ বাড়ি, তিন পুরুষ আগে কেউ বানিয়ে থাকবে, পরপর্তী কোন পুরুষেই আর বাড়িতে মিস্ত্রী ঢোকায়নি। এমন কি একটা মজুরও না। প্যাসেজটা পার হয়ে যেখানে এসে পা ফেলল ওরা, সেখানটাই সে সাক্ষ্য দিল। দালানের ছাদের একটা কোণ কোনো এক ঝড়ে বর্ষায় ধ্বসে নেমে এসেছিল, তার ভাঙা জঞ্জালের স্তূপ দেয়ালের কোণেই স্তূপাকার করা আছে। কালের জল-বাতাসে সেই স্তূপের উপব গাছ গজিয়েছে, আকাশের অকৃপণ দানে সেই কোণটায় এক ঝলক আলো।

দেয়ালের বালি খসা, মেঝের চাপড়া ওঠা, জানলার পাল্লা ভাঙা, কিন্তু দালানটা প্রকাণ্ড ঘরগুলো বড় বড়। অনেকগুলোই ঘব বোধহয়, ছুটো ঘর তো পার হল সোমেন সুরথকে নিয়ে।

ভ্যাপসা ভ্যাপসা অন্ধকার অন্ধকার এই ঘর ছুটোয জিনিসপত্র যা আছে, তার জাতি-নির্ণয় শক্ত। কি যে আছে, কি যে নেই কে জানে, তবে মনে হচ্ছে কোনো এককালে বোধহয় একখানা তাঁত চালানো হতো, তারই ভগ্নাবশেষটুকু ঘাড় ভেঙে পড়ে আছে।

'বাসাটা বেশ ভালই জোগাড় করেছ।' সুরথ টিটকিরির গলায় বলেন, তোমার উপযুক্তই। ইঁদুব আরসোলা চামচিকে বাছুড়রা এই রকম বাসাই পছন্দ করে।'

সোমেন হঠাৎ হেসে ওঠে। বলে, 'আমার কথার ধরন বদলায়নি বলছিলে না? তোমার কিন্তু ভীষণ ভাবে বদলে গিয়েছে।'

'তাই নাকি ?

'যায়নি ? নিজেই ভেবে ছাখো, আগে তোমার কথবার্তা কত মার্জিত আর ভদ্র ছিল।'

'তাই ছিল বুঝি ? আর সেই মার্জিত ভদ্রতার সুযোগটাই নিয়ে ছিলে, কেমন ? কিন্তু এখন আর সেই 'ভদ্রতার ছেলেমানুষীটা নিয়ে বোকামি করি না। তাছাড়া—চামচিকে বাদুড় ইঁদুর আরসোলার সঙ্গে ভদ্রতার কোন প্রশ্নই ওঠে না।'

'তা সত্যি।' বলে সোমেন একটা ছেঁড়া বিবর্ণ ছিটের পর্দা ঝোলানো দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়, বলে, 'আচ্ছা এক মিনিট—

ঢুকে যায় পর্দা ঠেলে।

মিনিট খানেক পরে বেরিয়ে এসে বলে 'এস।'

আশ্চর্য, সুরথ সেন নিতান্ত বাধ্য ব্যক্তির মত ওর পিছু পিছু ঢোকেন।

এ ঘরটা অপেক্ষাকৃত ছোট, তবে অবস্থা আগের ঘরগুলোর মতই। দেয়াল ভাঙা, মেঝেয় খাপরা ওঠা ছোট্ট ছোট্ট জানলার দরুন মাঝখানটা অন্ধকার।

সেই ক্ষুদ্র গবাক্ষের গায়েও পদা ঝোলানো থাকার জন্যে আরো অন্ধকার।

সেই আধো আলো-ছায়ার মাঝখানে একটা চৌকি পাতা, তার উপর একটি মৃত্যুশয্যা পাতা।

এক নজরেই ধরা পড়ল, এ শয্যা মৃত্যুশয্যা ছাড়া আর কিছু নয়।

সোমেন বিছানার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে সুরথের দিকে ইশারায় একটা আহ্বান জানাল।

রাজধানীর এক কেষ্টবিষ্টু অফিসার, সরকারের 'ডান হাত'দের একজন 'উন্নাসিক' বলে সমালোচিত সেনসাহেব, ওই নোংরা গরীব চেহারার লোকটার ওই চোখের ইশারাটুকুতেই যেন মন্ত্রপূতের মত সরে এসে দাঁড়ালেন।

ঘরটা মলিন, কিন্তু বিছানাটা ফর্সা ধবধবে আর ধবধবে রক্তশূন্য রোগীর হাত দুখানা—যে হাত দুখানা বুকের ওপর জড়ো করে রাখা রয়েছে। হয়তো শুধুই রক্তশূন্যতার জন্যেও নয়, এক সময় গায়ের রংটা দুধে ফর্সাই ছিল। স্বাস্থ্যের জ্যোতিতে সেই দুধে রংয়ে একটা লালচে ছাপ ছিল। এখন অবশ্য বিশ্বাস হওয়া সম্ভব নয়, ওই শরীরটা স্বাস্থ্যের জ্যোতিতে ঝলমলে ছিল।

মুখের রংটা কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করছে। মুখটায় যেন তুষার ছাপ। চোখের কোণে, গালের হাড়ের গর্তে, চিবুকের নীচে সেই তুষার প্রলেপ গাঢ় ঘন।

চোখ বোজা।

সুরথ সেন স্থিরচোখে তাকিয়ে রইলেন সেই চোখবোজা মুখটার দিকে। যেন গভীর সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে সেই আগের মুখটাকে খুঁজতে চেষ্টা করছেন, যেন খুঁজে না পেয়ে হতাশ হচ্ছেন।

কিন্তু খুঁজে পাবার আশা নিয়েই কি এসেছিলেন সুরথ সেন?

'যমের থাবা বসলে কি মানুষ অবিকল থাকে? উনিশ বছর সময়টাই কি কম?

কতক্ষণে এমনভাবে তাকিয়েছিলেন কে জানে, হয়তো খুবই সামান্য সময়, তবু সুরথের নিজের মনে হল এই বোবা অবস্থাটা যেন 'মুহূর্তের' গণ্ডি ছাপিয়ে অনেকটা সময় নিয়ে নিচ্ছে। সুরথ ওকে ঠেলে ফেলবেন কি করে?

ঠেলে ফেলল সোমেনই।

আস্তে ডাকল, 'জয়া! সুরথ এসেছে।'

'কে? কে এসেছ?'

ঘুমের তলা থেকে যেন সাপের বিষে আচ্ছন্ন নাগকন্যা জেগে উঠল।

কালিপড়া গহ্বর থেকে যে চোখটা ঝলসে উঠল, তার মধ্যে উনিশ বছর আগের আগুন।

'ব্যস্ত হয়ো না। চেয়ে দেখ—সুরথ এসেছে।'

কিন্তু বলার দরকার আর ছিল না, তার আগেই তো চোখ পড়েছে সুরথ সেনের ওই নির্নিমেষ চোখদুটোর ওপর।

কিছুক্ষণ চুপ।

যেন সমস্ত সময়টা আবার বোবা হয়ে গেল।

যেন বোবা হয়েই থাকবে

একটু পরে একটা নিশ্বাস পড়ল। দুঃখের নয়, বিষাদের নয়, ক্লান্তিরও নয়, তীব্র অভিযোগের।

'সেই তুমি ওকে আনালে?'

সোমেন হাসল।

সোমেন সেই হাসির গলাতেই বলল, '[illegible] আনাই, এমন কি সাধ্য আমার? ও নিজে না এলে?'

'তুমি খবর দিয়েছিলে—'

'তা একটা দিয়েছিলাম বটে—' সোমেন সপ্রতিভ গলাতেই বলে, '[illegible] করছি। বলতে গেলে পারি না ও [illegible] শিখেছে, অথবা হঠাৎ দুঃস্বপ্ন দেখে ছুটে এসেছে।'

'থাম।'

হঠাৎ ধমকের গলায় বলে সুরথ সেন, 'বাচালতা রাখ। চিকিৎসা কী হচ্ছে?'

'চিকিৎসা?'

সোমেন [illegible] বলে, 'পরিবেশটার [illegible] কিঞ্চিৎ [illegible] কথার [illegible] পেয়েছি না।'

'তার মানে কিছুই হচ্ছে না।'

সুরথ যেন তাঁর নিজের ঘরের ডানলোপিলোর সোফার স্মৃতি বিস্মৃত হয়ে, বিছানার কাছে পড়ে থাকা একটা হাতল-ভাঙা নড়বড়ে

চেয়ারে বসে পড়ে বলেন, 'পরের বৌকে নিয়ে ভাগবার আগে একবার নিজের মুরোদটার ওজন করে দেখতে হয়, বুঝলে?'

এবার সেই ক্ষীণ কণ্ঠ কথা বলে ম্লান হাসির সঙ্গে, 'ওকে ভগবানও মেরেছে।'

'তা তো মারবেই।'

সুরথ অগ্নিদৃষ্টিতে সোমেনের শতছিদ্র গেঞ্জি পরা হাড়-জিরজিরে বুকটার দিকে তাকিয়ে আরো কঠোর গলায় বলেন, 'শয়তানের সৈন্যকে আর কে মারবে ভগবান ছাড়া।'

'ঠিক, আমিই তার প্রমাণ।' [illegible]

ক্ষীণ হলেও স্পষ্ট স্বর।

সুরথ যেন একটু থমকে গেলেন। [illegible] জবাবের জন্যে যেন প্রস্তুত ছিলেন না [illegible]।

একটু থেমে বলেন, 'রোগ ব্যাধি এরও স্বাভাবিক ঘটনা।'

'এই তো? এ কথা ওকে বোঝাও একটু।' সোমেন বলে, 'ওর যেন ভিতরে ভিতরে ধারণা—'

'তুমি একটু চুপ করবে?'

এবার সেই ক্ষীণ কণ্ঠে তার প্রতিবাদ ওঠে, আর তার প্রতি-ক্রিয়াতেই বোধহয় প্রবল একটা কাশির উচ্ছ্বাসে ওর আর কথা কইবার ক্ষমতা থাকে না।

সোমেন একখানা পাখা নিয়ে জোরে জোরে বাতাস করে, আর সুরথ সেন নামের বাঘা লোকটা অসহায়ের মত শুধু এদিক-ওদিক তাকিয়ে যেন এই যন্ত্রণার ওষুধ খোঁজেন। আর তারপর হঠাৎ প্রায় চীৎকার করে বলে ওঠেন, 'এই না স্কুল. এখানে ডাক্তার বলে কোনো জীব আছে, না নেই?'

বাস্কেল কিন্তু এই ধমকে বিচলিত হয় না। দিব্যি আত্মস্থ গলায় বলে, 'ডাক্তারের আর কিছু করার নেই সুরথ।'

সুরথ যেন অসহায়তার কুয়াশা থেকে নিজের পদমর্যাদায় ফিরে

যান, তাই কড়াগলায় বলেন, 'তোমার মতন অপদার্থ এ ছাড়া আর কী বলবে। কিন্তু কোনো কাউকে মেরে ফেলার অধিকার কারুর নেই বুঝলে?'

সোমেন যে নির্লজ্জ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, তাই এমন কথার পরও হেসে ওঠে। হেসেই বলে, 'তুমি যে হাসালে সুরথ, অপরকে মেরে ফেলার অধিকারটা তো মানুষের জন্মগত অধিকার। কেউ কারুর অসুবিধে ঘটালে সে তাকে মেরে ফেলবে এটাই তো পৃথিবীর নিয়ম। অহরহ দেখছ না চারদিকে?'

সুরথ সেনের কপালটা কুঁচকে ওঠে।

'এখানে অসুবিধেয় ফেলার প্রশ্নটা আসছে কোথা থেকে?'

'আসছে বৈকি। অসুবিধে বলে অসুবিধে। আজ উনিশ বছর ধরে এই মহিলাটি আমায় অসুবিধের পাথারে ডুবিয়ে রেখে দিয়েছেন।'

'ও! তাই বুঝি এই মেরে ফেলার পথটাই গ্রহণ করেছ?'

'ব্যাপারটা প্রায় তাই—' সোমেন মৃদুহাসির সঙ্গে বলে, 'তবে আমি লোকটা ভাগ্যবান, তাই ভগবান আমার কর্মভার হাতে তুলে নিয়ে কাজটা সহজ করে দিচ্ছেন। অবশ্য আমিও কিছুটা সাহায্য করছি তাঁকে, যেমন ডাক্তার-টাক্তার আর ডাকছি না, ওষুধপত্রের পাটও প্রায় তুলে দিয়েছি। তাছাড়া—'

সুরথ সেন হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে ওর হাড়ে খোঁচা কাঁধটা চেপে ধরে বলেন, 'তোমায় আমি দাঁড় করিয়ে গুলি করব শূয়ার!'

সোমেন কাঁধটা নিচু করে ছাড়িয়ে নিয়ে হেসে উঠে বলে, 'এনেছিস তাহলে অস্তরটা? আহা বার করে দেখা না একবার ভাই।...এই রে—'তুই' বলে ফেললাম! এতবড় একটা মান্যগণ্য লোক! মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেছে বুঝলি, পুরনো কালের বদঅভ্যাস তো—'

সুরথ সেন আবার বসে পড়েন সেই নড়বড়ে চেয়ারটায়।

ক্লান্ত গলায় বলেন, 'কাল জিনিসটা কী অদ্ভুত। যেটা চলে যায়, তাকে কিছুতেই আর ফিরিয়ে আনা যায় না, তাই না?'

সোমেনের বসার সুবিধে নেই, সে তার ক্রাচে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বলে, 'কালটাই চলে যায়, নাকি আমরাই কালের কাছ থেকে সরে আসি কে জানে।'

'হয়তো আমরাই সরে আসি', অন্যমনা গলায় বলেন সুরথ সেন, 'ঠিক! আমরাই সরে আসি। কিন্তু কিছুতেই আর একবারের জন্যেও পিছু ফিরে খানিকটা দূর ফিরে গিয়ে আবার শুরু করতে পারি না।'

সোমেন হেসে উঠে বলে, 'ভাগ্যিস পারি না। মানুষের সৃষ্টিকর্তা যদি মানুষকে সে ক্ষমতা দিতেন, তাহলে বিশ্বসুদ্ধ লোকই এগোতো, আর পিছু হাঁটতো।'

'সবাই এত ভুল করে না সোমেন।'

'করে, করছে, করবে।'

'করে? করছে? করবে?' সুরথ সেন সহসাই আবার সেনসাহেবের কণ্ঠস্বরে ধমকে ওঠেন, 'খুব সাফাই দেওয়া হচ্ছে যে নিজেকে। সবাই ভুল করে? ফিরে উল্টে সংশোধন করবার জন্যে বাকি জীবনটা মাথা খোঁড়ে? আমি, আমি যদি অন্ততঃ একবারের জন্যেও সে ক্ষমতা পেতাম, উনিশ বছরের ওপারে চলে যেতাম, বুঝলে? গিয়ে—তোমাকে আগাপাশতলা চাবকে বাড়ি থেকে বার করে দিতাম। না, বার করে দিতাম না, আগুনের আর শত্রুর শেষ রাখতে নেই, আমি তোমাকে দেয়ালের সঙ্গে পেরেক দিয়ে পুঁতে, গুলি করে করে ঝাঁজরা করে দিতাম।'

সুরথ সেন হাঁপাতে থাকেন।

এত ভয়ানক শাস্তির সম্ভাবনাতেও সোমেন নামের নির্লজ্জ লোকটা কিন্তু বিচলিত হয় না, অপমানিতও হয় না, শুধু সুরথের ওই উত্তেজিত মুখটার দিকে তাকিয়ে থাকে।

কিন্তু অন্য এক জায়গায় বোধহয় প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তবু সেও উত্তেজিত হয় না, বিচলিত হয় না, অপমানিত হয়েছে বলেও মনে হয় না। বরং প্রায় ব্যঙ্গের গলায় বলে ওঠে, 'শুধু ওকে?'

জয়াই বলল একথা।

আর জয়ার সেই রোগক্লান্ত গলায় হঠাৎ যেন কোথা থেকে একটা শক্তির জোয়ার এল। খুব স্পষ্ট শোনা গেল জয়ার গলা, 'আর কাউকে নয়?'

সুরথ ওই কথা বলা মুখের দিকে তাকান।

সুরথ নিঃঝুম মেরে যান।

তারপর সেই চোখের নিচে কালি মেড়ে যাওয়া মুখটার দিকে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে তাকিয়ে থেকে ঠাণ্ডা গলায় বলেন, 'না, কারণ ওর থেকে বেশি শাস্তির কথা আমার জানা নেই।'

'ওঃ! আমি ভাবলাম কী হল এটা? পাপীর সাজা আছে, আর তার পাপের সঙ্গীর সাজা নেই?'

'স্বভাব যায় না মলে' প্রবাদ সাহিত্যের এর থেকে সত্য প্রবাদ বোধহয় আর নেই। তা নইলে সোমেন এখনো আগের মত সব কথায় হাসে! হেসে ওড়ায়!

টেরই পায় না, ওর ওই কাটা পা, ফাটা চটা চেহারা, পেশী শীর্ণ মুখ আর শতছিদ্রের জালিকাটা গেঞ্জিটার সঙ্গে হাসি জিনিসটা বড় বেমানান।

টের পায় না বলেই হেসে উঠে বলে, 'মানুষের হয়তো ওর থেকে বেশী শাস্তির পদ্ধতি জানা নেই, কিন্তু মানুষের বিধাতার আছে, বুঝলি? অতএব আক্ষেপ করবার কিছু নেই।'

সুরথ সেনের দৃষ্টিটা হয়তো নিজের অজ্ঞাতসারেই ওই মুখটার ওপর পড়েই রয়েছে। তাই কথাটা ওকে উদ্দেশ্য করেই বলা হয়ে যায়, 'হুঁ! তা তো দেখতেই পাচ্ছি। তা বিধাতার শাস্তিটা শুরু হবার আগেই মৃত্যু সংবাদটা রটনা করা হয়েছিল কেন?'

জয়াকে কি কেউ হঠাৎ কোনো দৈব ওষুধ দিয়ে গেল ? নইলে জয়া এত কথা বলার শক্তি পাচ্ছে কোথা থেকে ? জয়া যে সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিতে পারছে 'শাস্তি যে কখন শুরু হয়, সে কী বাইরে থেকে দেখা যায় ? না বোঝা যায় ?'

'মৃত্যু-সংবাদটা অবশ্য আমিই দিয়েছিলাম—' সোমেন বলে, 'তবে ওই মহিলাটির প্ররোচনাতেই। ওঁর যুক্তি আর সিদ্ধান্ত ছিল, যেহেতু ডিভোর্সের নোংরামী তুই করতে পারবি না, সেই হেতু তোর বাকি জীবনটা বরবাদ চলে যাবে। মৃত্যু-সংবাদের চিঠিটা তোর দলিল হয়ে থাকবে। ইচ্ছে করলেই আবার নতুন জীবন শুরু করতে পারবি।'

সুরথ সেনকে হঠাৎ যেন বড় অসহায় দেখায়, যেন কোথাও কোনো শক্তি খুঁজে পাচ্ছেন না, কিন্তু দেখা গেল ওই অসহায় থেকে সামলে ওঠার ক্ষমতাও তাঁর মধ্যে আছে।

তাই একটুক্ষণ মূঢ়ের মত তাকিয়ে থেকে বিদ্রূপের গলায় বলে ওঠেন, 'ওঃ দয়া! করুণাময়ীর করুণা! হ্যাঁ, করেছিই তো নতুন জীবন শুরু। আর সে জীবনে—'

হঠাৎ আবার যেন নিভে যান সেন সাহেব। বলে ওঠেন, 'তোদের এখানে ভদ্রলোকের পানযোগ্য জল আছে ? পাওয়া যাবে ?'

গালমন্দে সোমেন চুপসে যায়নি, কিন্তু হঠাৎ এই প্রশ্নটায় যেন চুপসে গেল। আস্তে বলল, 'ডাব আছে, তাই কেটে দিই না হয়।'

'ডাব আছে ? মানে রুগীর জন্যে আছে ?'

সুরথ সেন তীব্র গলায় বললেন, 'দেখে তো মনে হচ্ছে না ডজন ডজন কেনা আছে ? তার মানে রুগীর তেষ্টার জলটুকু খেয়ে নিতে বলছিস হতভাগা ?'

এবার সোমেন আবার হাসে, 'কিনতে হলে একটাও থাকত না সুরথ, রুগীর কাছেও 'ডাবের জল' স্বর্গের মন্দাকিনী বারির মতই দুর্লভ হতো। নেহাৎ নাকি কবে কোন একটা হতভাগা চাষা ওনাকে

মাতৃ সম্বোধন করে মরেছিল, সেই ব্যাটাই মাতৃভক্তিতে উথলে উঠে ডাব জুগিয়ে যাচ্ছে নিয়মিত। নারকেল কুঞ্জ আছে বোধহয় লোকটার। কোথাকার কোন টিউবওয়েল থেকে 'পানীয় জল' এনেও যোগান দিয়ে যায় এক কলসী করে! ওই কর্মটি তো আর এই ল্যাংড়ার দ্বারা হয়ে ওঠে না। ওই টিউবওয়েল খ্যাচাং খ্যাচাং। তবে ব্যাটাকে বেশীদিন আর মাতৃঋণ শোধ করতে হবে না, এই যা।'

'সোমেন, তোমাদের মত লোককেই বোধহয় পিশাচ বলে।'

'তা হতে পারে। অথবা ওর থেকে আরো উচ্চমানের বিশেষণও থাকতে পারে। কিন্তু তুই বোস আমি একটা ডাব কেটে আনি।'

সুরথ সেন ওই লোকটাকে 'পিশাচ' বলছেন, 'শয়তান' বলছেন, যত ইচ্ছে কটু গালমন্দ করছেন, তবু ক্রোধে ফেটে পড়তে পারছেন না কেন? কেন জগতে সমস্ত তিক্ততা আর ঘৃণা কণ্ঠে ঢেলে বলে উঠতে পারছেন না, 'তোর কাছে জল চেয়েছিলাম আমি মতিভ্রমের বশে। খবরদার দিতে আসিস নি। তোর মত নোংরা লোকের হাতে, আর এই দৈন্যদশাগ্রস্ত পরিবেশে আমি জল খেতে যাব কোন দুঃখে রে? আর বলি—কোন গেলাসেই বা তুই তোর সেই দাতব্যের ডাবের জল দিবি আমায়? দিল্লীর সেনসাহেবের কোয়ার্টার্স দেখেছিস তুই? ধারণা করতে পারবি—সেখানের আসবাবপত্র বাসন-টাসনের চেহারা? দু দুটো ফ্রীজ আছে সেখানে, জানিস তা? খাবার জলের দরকার হলে উর্দি-পরা বেয়ারা ট্রের উপর জল বসিয়ে ছুটে এসে জল দিয়ে যায়।'

বলতে পারছেন না।

পারলেন না।

আশ্চর্য, কেন পারলেন না?

লোকটা কি তুক্-তাক জানে? নইলে সেনসাহেব ওর সঙ্গে কথা বলছেন! ওর এই ভিখারির আস্তায় ভাঙা চেয়ারে বসে আছেন

বোকার মত ! সেনসাহেবের পরিচিত সমাজ যদি এই অবস্থাটা দেখে, অবিশ্বাসে পাথর হয়ে যাবে না ?

হ্যাঁ, একদা এক সময় দীনহীনের পাতার কুটিরেও সেনসাহেবকে দেখা যেত, উনি তখন পুনর্বাসন দপ্তরের একটি বড় দপ্তরধারী ছিলেন, কিন্তু সেই গিয়ে বসার মধ্যে কী রাজকীয় ভাব ছিল। কী খাতির পড়ে যেত সেনসাহেবকে ঘিরে। যেন ভক্তের কুটিরে ভগবান।

কিন্তু এখানে কী ?

যে ধৃষ্ট লোকটার একখানা চিঠির বঁড়শিতে গেঁথে গিয়ে সেনসাহেব বোকার মত এখানে ছুটে এসেছেন, সেই লোকটা ভক্তি সমীহ তো দূরে থাক, 'তুই' 'তুই' করে কথা বলছে সেনসাহেবকে ! এর থেকে অবিশ্বাস্য আর কী হতে পারে ?

তুক, তুকই জানে লোকটা।

তাই ওই সব বলবার উপযুক্ত কথা না বলে, বললেন কি না, 'তুই যাবি মানে ? তুই আবার কী করে—'

'সে আমি ম্যানেজ করছি রে বাবা, রাতদিনই তো চালাচ্ছি। রান্না-টান্না, কী নয় ? অবশ্য সে রান্না দেখলে লোকের কান্না এসে যেতে পারে। তবু চালিয়ে তো নিচ্ছি। মহিলাটি তো আজ বছরখানেক শয্যালগ্ন।'

সোমেন খট খট শব্দে পাশের একটা দরজা দিয়ে কোথায় যেন চলে যায়।

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে যেন একটা মৃত্যুর স্তব্ধতা নামে।

চেয়ে আছে পরস্পরের দিকে। হয়তো কয়েক লহমা।

তবু যেন অনন্তকাল।

সেই কালের মধ্যে হারিয়ে গেলেন সুরথ সেন। দেখতে পেলেন তাজা গোলাপের মত এক স্বাস্থ্যোজ্জ্বল যুবতী শুয়ে রয়েছে তাঁর সামনে, যার বিছানাটা রাজকীয়, পরিবেশটা বিলাস বহুল।

দু'হাতের মধ্যে একটা হালকা বালিশ লোফালুফি করতে করতে

ও বলছে, অসহ্য ! তোমার এই সেন্টিমেন্টের কোনো মানে হয় না ! জগতে অনেক অসুবিধেগ্রস্ত লোক আছে, তুমি তাদের অসুবিধে দূর করতে পারবে ?

সুরথ—নির্বোধ সুরথ বলে উঠলো, 'জগতের অনেক লোকের মধ্যে একজন তো নয় জয়া, লোকটা একমাত্রই। আমার সবচেয়ে বন্ধু।'

ওই সুন্দরী যুবতীর নামও তাহলে জয়া।

সতেরো বছর আগে যে আপন মৃত্যু ঘোষণা করেছিল।

তা জীবন মানেই তো মৃত্যুর সমষ্টি।

বহু মৃত্যুর মালা দিয়েই গাঁথা হয়ে ওঠে একটি জীবনমালা।

জয়া নামের মেয়েটা কতো মৃত্যু পার হয়ে এখানে এসে পৌঁছেছে, তার হিসেব কি সুরথ সেনের জানা ?

সেদিনের সেই জীবন ঐশ্বর্যে ভরপুর জয়া কি সুরথের ও ভাব প্রবণতার মধ্যে আপন মৃত্যুর ছায়া দেখতে পেয়েছিল ?

তাই অমন আতঙ্কিত হয়ে বলেছিল, 'এই বাড়িতে আমাদের দুজনের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি, এ আমি ভাবতেই পারছিনা।'

'দেখো, এলে কত সহজ হয়ে যাবে। সোমেনকে তো তুমি দেখোনি। ও যেখানে থাকে তার চারিধারে আহ্লাদের বন্যা বয়।'

'বুঝলাম', জয়া বললো 'তা সেই বন্যাটিকে নিজের ঘরে ডেকে আনা কি ঠিক ? জানোই তো বেনো জল ঢুকে ঘরের জল বার করে নিয়ে যায়।'

সুরথ এই কথাটাকে নেহাৎই কথার কথা বলে হেসে উঠেছিল।

'তুমি হাসছো, আমার কিন্তু ভালো লাগছে না।'

বলেছিল জয়া, 'আমাদেরই মুক্ত জীবনটা ব্যহত হবে নাকি ?'

'আরে সে বরং আরো মুক্তির হাওয়া এনে দেবে।'

'আহা আহ্লাদ ! এ আমাদের ইচ্ছে হলো একদিন বাড়িতে রান্না করলাম না, চাকরকে পয়সা দিয়ে নিজেরা বেরিয়ে গেলাম, সিনেমা

দেখলাম, হোটেলে খেলাম, রাতদুপুরে বাড়ি ফিরলাম, ছুটির দিনে টিনে কলকাতায় বাইরে চলে গিয়ে কাটিয়ে এলাম। ইচ্ছে হলে দিদির বাড়ি চলে গিয়ে তোমার অফিসে ফোন করলাম বাড়ি ফিরে আমায় দেখতে পাবে না, যেখানে দেখতে পাবে, সেখানে চলে এসো। হবে এসব ?'

সুরথ তবু আকাটের মতো বললো, 'না হবার ও কিছু নেই। ওতো আর একটা দুগ্ধপোষ্য শিশু নয় ? আমাদের জীবনযাত্রার ছন্দে ব্যাঘাত ঘটাবে। এমনই বা ভাবছো কেন ?'

জয়া বালিশটা সুরথকে ছুঁড়ে মেরে বলে উঠলো, 'আমার ভাল লাগছে না।'

'হে দেবী এতো অকরুণা কেন ? ছেলেটা মেসের ভাত খেয়ে অসুখে পড়ে যাবে, তোমার একটু দয়া পেলে—'

'বাঃ, ওর নিজের লোকের কাছে যাক না।'

'সে বস্তু থাকলে তো।'

সুরথ ওই অনমনীয়াকে নমনীয় করতে বলতে শুরু করলো, 'তিনকুলে কেউ নেই ওর। কে জানে কাদের দয়ায় লেখাপড়াটা শিখবার সুযোগ পেয়েছিল—'

'তা কাজকর্ম করে না কেন ?'

'করে তো।' বললাম না 'মহামায়া মহাবিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক।'

'ওঃ, মহামায়া। মেয়েদের পড়ানো ছাড়া আর কাজ জোটেনি বুঝি ?'

সুরথ হেসে ফেলে বললো, 'আমার বন্ধুকে ডাউন করতে গিয়ে নিজেদেরকেই ডাউন করছো। মেয়েদের পড়ানো কি এতোই অবজ্ঞার বস্তু ?'

'আমার মতে।'

'আমি তোমার সঙ্গে একমত হতে পারছি না।'

'করেই বা পারো? বেড়াতে যাবার সময় আমি যদি বলি পাহাড়, তুমি বল সমুদ্র, আমি যদি বলি পূর্ব তুমি বল পশ্চিম।'

'শেষ পর্যান্ত অবশ্য তুমিই বিজয়িনী হও।'

'জয়া তার চোখে মুখে তার নিজস্ব ভঙ্গীতে অপূর্ব মাদকতা ফুটিয়ে বলে, 'নামটা কী?'

'তাহলে সোমেন আসছে না।'

'গ্যাকামী কোরোনা! বলে বসে আছো, এখন কী বলে বারণ করবে?'

'যা ফ্যাক্ট তাই বলবো। বলবো গিন্নী আমাদের যুগল কুঞ্জে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি বরদাস্ত করতে রাজী নয়।'

জয়া উঠে দাঁড়িয়ে সেই হালকা তুলোর বালিশটা দিয়ে সুরথকে ধপাধপ পিটিয়ে দিয়ে বলে উঠলো, 'তা, বলবে বৈ কি। গিন্নীর মুখে চুণকালি দেবার এমন সুবর্ণ সুযোগ ছাড়বে তুমি? কাল সকাল বেলাই গাড়ি নিয়ে—নিয়ে আসবে তোমার সেই প্রাণের বন্ধুকে। কিন্তু এই বলে দিলাম—'

লীলায়িত ভঙ্গীতে বিছানায় গড়িয়ে পড়ে বলে উঠেছিল, 'জেনে রেখো, খাল কেটে কুমীর আনলে তুমি।'

সুরথ হেসেছিল।

ভেবেছিল সোমেনকে ও দেখেনি তাই।

সোমেন তো একটা বালক বললেই হয়।

বেপরোয়া ছেলেমানুষীতে ভরা চঞ্চল ওই ছেলেটাকে সোমেন বড় বেশী ভালবাসতো।

আর একটা ছবি দেখতে পেলো সুরথ।

কাঁধ থেকে এক শান্তিনিকেতনী ঝোলা আর এক হাতে একটা সুটকেশ নামিয়ে সোমেন বলে উঠলো, 'এলাম আশ্রমপীড়া ঘটাতে।'

আর সুরথ কৃতার্থ হয়ে দেখলো, যে জয়া গত দুদিন ধরে এই ঘটনাটাকে কেন্দ্র করে অনবরত বিরক্তি প্রকাশ করেছে, যে হাসিতে

উচ্ছল হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললো, 'মাঝে মাঝে কিছু পীড়ারও দরকার। সেটাও সুস্থ থাকার একটা উপায়।'

'দেখবেন এমন উৎপাত করতে শুরু করবো যে দুদিনেই দূর দূর করে তাড়িয়ে দিতে পথ পাবেন না।'

জয়া তার অপরূপ ভুরু দুটোকে আরো অপরূপ ভঙ্গীতে কপালে তুলে বললো, 'আমার শক্তি সম্পর্কে আপনার ধারণায় কিছু ভুল আছে।'

'ঠিক আছে। তবে আজ থেকেই লড়াই শুরু হোক, দেখি কে হারে কে জেতে।'

সুরথ তখন বললো, 'জয়াতো সর্বদাই জয়ী। তবে উনি হচ্ছেন ইচ্ছাময়ী। ইচ্ছে হলে জিতবেন, ইচ্ছে হলে হারবেন।'

সোমেন নামের ঝাঁকড়াচুল ছেলেটা হেসে বললো, 'বাঃ খুব ইণ্টারেষ্টিং তো।'

কিন্তু তখন কি সোমেন নগদা খদ্দরের পায়জামা আর গেরুয়া খদ্দরের পাঞ্জাবী পড়তো ?

না, তখনো সোমেন ওই সমাজসেবীর দলে ভেড়েনি। বিশেষ একটা খাতায় নাম লেখায়নি।

সোমেন তখন কবিতা লিখতো, গান গাইতো। আর কবিতা আবৃত্তি করতো।

এ শখ জয়ারও ছিল।

ওদের ওই 'আবৃত্তি প্রতিযোগিতা' বসে বসে উপভোগ করতো মুখ্যু সুরথ।

ওরা 'গান্ধারীর আবেদন' আবৃত্তি করতো, করতো 'কর্ণ কুন্তী সংবাদ।'

আর 'কচ ও দেবযানী।'

শেষোক্ত এই পালাটাতেই হঠাৎ প্রথম সুরথের অনাবিল উপ-ভোগের সুখে চিড় ধরলো।

সুরথের মনে হলো, ওদের বক্তব্যের আবেগটা শুধুই যেন কচ ও দেবযানীর নয়।

সুরথ নিজের চিন্তাকে ধিক্কার দিল।

নিজেকে ধিক্কারের সমুদ্রে ভাসাবার জন্যে সেদিন নিজেকে ধিক্কার দিয়েছিল সুরথ।

সোমেন বলেছিল, 'সুরথ আমায় ছাড়, বনের পাখী খাঁচায় বসে ছোলা ছাতু খেতে খেতে হাঁপিয়ে পড়েছে।'

সুরথ ছাড়েনি।

তারপর আর এক পট পরিবর্তন।

সোমেন রাজনীতিতে নামলো. সোমেন তুমাসের জন্যে জেলের ভাত খেয়ে এলো, সোমেন গেরুয়া পাঞ্জাবী ধরলো

আর সোমেন ক্রমশঃই হীরো হতে লাগলো জয়ার চোখে।

সেই সঙ্গেই কি সুরথ নামের লোকটা নেমে পড়তে লাগলো তার অবজ্ঞা আর অবহেলার সিঁড়ি বেয়ে?

হয়তো তাই।

হয়তো ওই দুর্বার প্রাণশক্তিতে ভরা দুর্জয় অহঙ্কারী মেয়েটা চেয়েছিল সুরথ তার পৌরুষ প্রকাশ করুক, সুরথ তার স্বামীর অধিকার জাহির করুক।

কিন্তু সুরথ তা করেনি।

সুরথ তখনো বিশ্বাসের ভূমিতে দাঁড়িয়ে।

সুরথ তখনো মনে করছে, জয়ার যা কিছু হৈ চৈ মুখে।

মনে করছে সোমেন শক্তিমান।

সুরথ ভদ্রতা আর সভ্যতার পালিশগুলো ঝকঝক করছে তখনো।

শুধু জয়া মাঝে মাঝে ওয়ার্নিং দিয়েছে, 'কুমীর কিন্তু ঘরের দরজায়।'

বলেছে পরে 'মাথা চাপড়াতে হবে হে অহঙ্কারী ভদ্রপুরুষ।'

কিন্তু এসব কথা কি সত্যি বলে ভাবে কেউ?

অথচ ও মৃত্যু সংবাদটা এক মুহূর্তে সত্যি বলে ভাবতে পেরেছিল সুরথ।

তাই সেই চিঠিটাকে মুচড়ে মুচড়ে এতোটুকু দলা করে ফেলে দিয়ে মনে মনে বলেছিল, 'জানতাম! জানতাম! তুমি মরবে।'

সুরথ ভেবেছিল এ মৃত্যু আত্মহত্যা।

তারপর হঠাৎ একদিন কী এক আকস্মিক খেয়ালে সুরথও আত্মহত্যা করে বসলো।

তারই এক সহকর্মীর স্কুল মাষ্টার বোনকে বিয়ে করে বসলো।

বিভা তার সেই স্কুলটাকে ছেড়েছিল কিন্তু মাস্টারীটা ছাড়েনি।

জীবন ভোর চালিয়ে আসছে।

আশ্চর্য্য। আশ্চর্য্য।

সুরথ এখনো অবাক হয়ে ভাবছেন, 'এযাবৎ কিভাবে সহ্য করে আসছি আমি।'

আমি তদন্ত করতে আসিনি জয়ার মৃত্যুর ঘটনাটা কী!

কতো হেসেছে সোমেন।

কতো ব্যঙ্গ করেছে জয়া তার প্রাক্তন স্বামীর প্রাক্তন প্রেমকে।

সবই কালের স্রোতে গড়িয়ে যায়।

তা নইলে মানুষ বাঁচতে পারে না।

শুধু এক এক সময় রক্ত উত্তাল হয়ে ওঠে, স্নায়ুশিরা সমস্ত ছিঁড়ে পড়তে চায়, অতীতের এক ভুল ছাপা পৃষ্ঠায় মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করতে ইচ্ছে করে।

সামনে ওই মৃত্যুপথ যাত্রিনীর চোখে চোখে চেয়ে বসে আছেন সুরথ সেন। বিভা বলে কেউ তাঁর জীবনে আছে ভুলে গিয়ে। বসে আছেন অনন্তকাল।

সেই কালটা পার হল, আবার দালানের ওধারে কোথায় খটাখট শব্দ উঠল।

তার মানে শব্দের মালিক আসছে।

সুরথ একটা নিঃশ্বাস ফেললেন।

'আর অতীত ভাবিষ্যৎ কোনো কথার ধারে-কাছে না গিয়ে একেবারে বর্তমানের একটা কথা বলে বসেন, 'রান্নাটান্না করে দেবার মত একটা লোক যোগাড় করা যায় না এখানে?

জয়া হয়তো এ প্রশ্নের জন্যে প্রস্তুত ছিল না। হয়তো অন্য কোনো তীব্র প্রশ্নের প্রত্যাশায় তাকিয়ে ছিল। তাই হয়তো হতাশ হল।

আর বোধ করি সেই হতাশা থেকেই একটা হিংস্র ব্যঙ্গ ফুটে উঠল ওর মুখে। মুমূর্ষু রোগীর মুখে যেটা খাপ খায় না।

তবু ওই বেখাপ্পা কাজটাই করল জয়া। ব্যঙ্গের গলায় উত্তর দিল, 'লোক? কেন যোগাড় করা যাবে না। কত লোক আছে।'

'তবে? ওর পক্ষে কি এই সব সম্ভব?'

জয়ার নিভে যাওয়া চোখের কোলে যেন পলাতক আগুনের একটা ছিটে ছিটকে এসে ঝলসে ওঠে।

সোমেন নামের ভাগ্যের মার খাওয়া লোকটাকে কি ঈর্ষা করছে জয়া?

হয়তো করছে।

উনিশ বছর পরে যে লোকটা তুচ্ছ একটা চিঠির খবরে এমন ছুটে চলে এসেছে, যেখানে এসে বসা ওর পক্ষে একটা অসম্ভব অবাস্তব ব্যাপার, সেখানে এসে বসেছে, সে কি ওই সোমেনের জন্যে?

তাই ওর সমস্ত সহানুভূতি, আর লক্ষ্য ওই হতভাগাটার ওপরই গিয়ে পড়ছে।

সেই আগুনের ছিটে ঝলসানো চোখে চেয়ে আরো হিংস্র আর নিষ্ঠুর গলায় বলে জয়া, 'কার পক্ষে কতটা সম্ভব, সে কি আর তোমাদের মত রাজা-রাজড়াদের বোঝা সম্ভব? শুধু রান্না কেন, ওকে তো বাসনও মাজতে হয় তা ছাড়া একটা মড়া আগলে পড়ে থাকতে হলে যা যা করা দরকার সবই করতে হয়। মানে বুঝতে

পারছ ?'

সেনসাহেবের একটা গভীর নিঃশ্বাস পড়ে, বুক থেকে না আরও কোন গভীর থেকে। সেই নিঃশ্বাসের সঙ্গে বলেন, 'পারছি।'

'গুলি করে আর কতটুকু ফুটো করতে পারতে তুমি ওকে ?'

সেনসাহেব কিছু বলার আগেই সোমেন এসে ঢোকে। কেমন সুকৌশলে বাগিয়ে একটা কাঁচের গ্লাসে এক গ্লাস ডাবের জল এনে বাড়িয়ে ধরে সুরথের দিকে।

সুরথ হাতটা না বাড়িয়ে বলেন, 'আমার আর দরকার নেই, ওটা বরং যার দরকার তাকেই দে।'

সোমেন নির্লজ্জের হাসি হেসে উঠে বলে, 'তোর আর দরকার নেই ? এই এক মিনিটেই সব তেষ্টা মিটে গেল ? নে, খা। ওর আছে। একটু পরে খাবে। নির্ভাবনায় খা, গেলাসটা পরিষ্কার, আর ডাবের জল তো ? হস্তদ্বারা স্পর্শিত নয়।'

হাতটা বাড়িয়ে দেন সুরথ সেন।

না দিয়ে উপায়ও ছিল না।

তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিল।

সোমেন খালি গ্লাসটা নিয়ে বলে, 'কী ব্যাপার বল তো ? জয়া দেবীর বেশ জোর জোর গলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম মনে হচ্ছিল। বিশল্যকরণীর গুণ নাকি ?'

'উল্লুকের মত কথা বলিস না—'সুরথ সেন কড়া গলায় বলেন, 'আমার আগের কথার জবাব দে। এই স্বর্গীয় ভূমিতে 'ডাক্তার' বলে কোনো প্রাণী আছে ?'

সোমেন মৃদু হেসে বলে, 'আছে বলে জানতাম, স্টেশনের কাছে লাইনের ওপারে ডিস্পেন্সারি ছিল, এখন আর আছে কি না সঠিক বলতে পারব না।'

'তার মানে ?' সেনসাহেব তীব্র স্বরে বলেন, 'কেন, দেশ থেকে কি রোগব্যাধি সব উঠে গেছে ? তাই ডাক্তার জাল গুটিয়ে চলে গেছে ?'

'চলে গেছে তা বলিনি।' সোমেন বলে, 'শুধু বলছি—থাকার খবরটা অনেক দিন আর রাখি না।'

'কী? খরচের খাতায় লিখে দিয়েছ বলে? বাজে খরচ আর করবে না বলে?'

জয়ার কণ্ঠ আবার ঝলসে ওঠে 'এত বুদ্ধি ধর, শুনতে পাই তুমি বিহনে মিনিষ্ট্রি অচল, আর এইটুকু বুঝতে পারছ না, খরচ করবার মত টাকা না থাকলে সব দরকারই বাজে খরচের খাতায় ওঠে।'

সুরথ একটু তাকিয়ে দেখেন, তারপর গম্ভীর হাস্যে বলেন, 'আমার সম্পর্কে এত খবর তোমায় সাপ্লাই করে কে?'

'খবর তো বাতাসে হাঁটে।'

'হুঃ!'

সোমেন বগলের ক্রাচটায় একটু চাপ দিয়ে, একটু এগিয়ে এসে হঠাৎ গাঢ় গলায় বলে, 'সুরথ! মনে হচ্ছে তুই যদি দু-একটা দিন থেকে যেতে পারতিস, তাহলে বোধহয় ডাক্তারের আর দরকার হতো না। জয়া চাঙ্গা হয়ে উঠত।...আঃ, কতদিন জয়ার মুখে এমন ভাষা শুনিনি! কতদিন এমন স্পষ্ট গলার স্বর শুনিনি!...থাকা যায় না—না?'

সুরথ আর একটু গম্ভীর হাসি হাসেন।

'তুই কাকে কি অনুরোধ করছিস, খেয়াল আছে?'

সোমেন বলে, 'খুঁড়দের খেয়ালটা একটু কম সুরথ।'

'সেই কম খেয়ালটা নিয়ে তো পৃথিবীতে চরে বেড়ানো যায় না। যাক. যা বলছি শোন। জয়াকে হসপিটালে নেওয়াতে হবে, মানে কোনো ভাল নার্সিংহোমে।'

'বল কী?'

'যা বলছি ঠিকই বলছি। স্থানীয় যে ডাক্তার ওকে কোনোদিনও দেখেছে, আমি একবার তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

জয়া আবার কথা বলে।

যেন সোমেনের কথাটাই সত্যি প্রতিপন্ন করবার ঝোঁক তার। যেন হঠাৎ কোনো বিশল্যকরণীই পেয়েছে সে।

তাই শুধু বলেই না, বেশ জোরে জোরেই বলে, 'তাহলে তুমি আবার আমার ভার নিতেই এসেছ? অগ্নিনারায়ণের কাছে দেওয়া শপথ পালন করতে?'

সুরথ গম্ভীর ভাবে বলেন, 'অতটা না ভাবলেও চলবে। ধরে নাও একটা আশ্চর্য ঘটনা দেখবার কৌতূহলে এসেছিলাম। সতেরো বছর আগে মরে যাওয়া একটা মানুষ আবার মরতে বসেছে কেমন করে—এই আশ্চর্য দৃশ্য দেখবার কৌতূহলে—'

'ওঃ।'

জয়া হঠাৎ বালিশের ওপর ঘাড় তুলে উত্তেজিত গলায় ব 'তাই! তাই বুঝি ভেবেছ যে তুবার মড়া, মড়ার ওপর যত ওকে খাঁড়ার ঘা বসানো যায়? তুমি যাও। যাও এখান থেকে। কে ডেকেছে তোমাকে আমার জন্যে মাথা ঘামাতে? ওই, ওই হতভাগা শয়তান, কেমন? আমাকে না জানিয়ে। তলে তলে তোমার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে—'

'আঃ জয়া! উত্তেজিত হচ্ছ কেন?' সোমেন এগিয়ে এসে একটা খাটে ভর দিয়ে আর একটা হাত বাড়িয়ে জয়ার ঘাড়টা বালিশে নামিয়ে দিয়ে, তাড়াতাড়ি বাতাস করতে করতে বলে, 'হ্যাঁ বলেছি তো আমিই ডেকেছিলাম? কিন্তু তাতে অত বিচলিত হওয়া তো শোভা পায় না। আমার শয়তানীর পরিচয় তো এই নতুন পাচ্ছে না। তবে সত্যি বলছি, ওর হাতে আবার তোমার ভার তুলে দেবার জন্যে আমি ওকে ডাকিনি। ডেকেছিলাম—স্থির হয়ে শোও বলছি—আমার মত পাষণ্ডের মুখে কথা বেধে যাওয়া মানায় না—ডেকেছিলাম যদি মুখাগ্নিটা ও করে এই আশায়। ওটাতে ওরই ন্যায্য অধিকার কি না। সেদিনের অবস্থায় ভেবেছিলাম, সত্যিই যদি ও আসে, এসে

দেখবে ওর কাজ এগোনোই আছে, ব্যবস্থা সব প্রস্তুত, শুধু হাতটা লাগালেই—'

জয়া চুপ করে ছিল।

জয়া হাঁপাচ্ছিল।

এখন জয়া খুব শান্ত গলায় বলে, 'কেন? তার জন্যে এত ঘটার কী ছিল? তুমি এত পেরেছ, এত পারছ, আর ওটুকু পারতে না?'

'পারতাম, পারতেই হতো। তবু একটা দুঃসাহসিক কৌতূহল হয়েছিল। মিথ্যে বলব না সুরথ, সত্যি সত্যিই হঠাৎ একটা কৌতূহলের বশেই—মানে দেখতে ইচ্ছে হল, ভস্মস্তূপের নিচে এখনো আগুনের অবশিষ্ট আছে কি না।'

সুরথ গম্ভীর হাসির সঙ্গে বলেন, 'তুই বাংলায় এম. এ. ছিলি, না? কিছুদিন বোধহয় কোনো একটা কলেজে বাংলার ক্লাসও নিতিস মনে হচ্ছে।'

সোমেনও মৃদু গম্ভীর হাসে, 'কথাগুলো কেমন সাধু ভাষা সাধু ভাষা হয়ে গেল, না রে? ব্যাপার কি জানিস? দুটো মানুষ প্রায় এই বিশ বছর ধরে আর বিশেষ কিছু তো করিনি, শুধু ওই কথার চাষই করেছি। কিন্তু জয়া তোমার পক্ষে আজ বড় বেশি কথা বলা হয়ে গেছে। পুরো একমাসেও বোধহয় তুমি এতগুলো কথা বলনি। কিন্তু এবার তো চুপ করতে হয়।'

'চুপ করতে হবে?'

জয়া হঠাৎ হেসে ওঠে, বাতিকগ্রস্তের মত হি হি করে, 'কী? চিরতরে? তোমাদের দুই বন্ধুর ষড়যন্ত্র সফল করতে? দিল্লীর অফিসের বড়কর্তা যাতে চটপট দিল্লীতে ফিরে যেতে পারেন? সরকারের দপ্তর না বানচাল হয়?'

সোমেন পাখাটা জোরে জোরে নাড়তে নাড়তে বলে, 'জয়া দোহাই তোমার, একটু স্থির হয়ে ঘুমোবার চেষ্টা কর। সুরথ, চল

আমরা বরং ওঘরে গিয়ে বসি। আমারই ভুল হয়েছিল, এভাবে তোকে ফট করে এখানে এনে বসানো ঠিক হয়নি।'

সুরথ কি সোমেনের নির্দেশে সুবোধ বালকের মত তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে ওঘরে গিয়েই বসবেন?

সুরথ অসহায়ের মত চারিদিকে তাকান। যেন এই পরিবেশটার মধ্যে থেকে উঠে যাবার ক্ষমতা ওঁর নেই।

সোমেন বুঝতে পারে।

সোমেন শান্ত গলায় বলে, 'আর নয়তো বরং আমিই যাই, তুই একা বসে থাক, তাহলে তো আর বচসা হবে না, বেশী কথাও হবে না। আর তুই—মানে বলছি কি মেলা বকাসনি ওকে—'

'না, আমি যাচ্ছি।'

সুরথ ওঠেন।

সোমেন ব্যগ্রভাবে বলে, 'না রে না। একজন কেউ ওকে আগলাচ্ছে ভাবলে, আমি অনেকটা রিলিফ পাব। কাজকর্মগুলো চটপট সেরে ফেলতে পারব।'

সুরথ বসে পড়েন না, চেয়ারের পিঠে হাত রেখে দাঁড়িয়েই বলেন, 'কাজটা কী?'

'আরে বাবা সে তোমার মত উচ্চস্তরের ব্যক্তির কাছে ব্যক্ত করবার মত কি? যত সব আজেবাজে।'

জয়াকে কথা বলতে বারণ করা হয়েছিল, জয়া তবু কথা কয়ে ওঠে।

যেন জয়ার কথার দরজাটায় পাথর চাপানো ছিল, হঠাৎ খুলে গেছে সেই দরজাটা।

এই রকমই বোধহয়।

মানসিক ক্লান্তি যখন অপরিসীম হয়ে ওঠে, তখন দেহযন্ত্রটাও সেই ক্লান্তির ভারে জখম হয়ে গিয়ে মূক হয়ে যায়। কথা বলার অনিচ্ছেই কথা বলার ক্ষমতাকে হরণ করে।

জয়ার মধ্যেকার দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্লান্তি ওর ওই ভাঙা দেহযন্ত্রটাকে একেবারে অচল করে তুলছিল দিনের পর দিন, জয়া নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতীত কথা বলতে ভুলে গিয়েছিল। আর সেই প্রয়োজনটা ক্রমশঃই সঙ্কুচিত হতে হতে একটা সংক্ষিপ্ত পরিধির মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিল!

সোমেন বলত, 'আজ সকালবেলাই বেশ রোদ উঠেছে, আকাশে কী আলো! সামনের জানলাটা খুলে দেব?'

জয়া বলত, 'দাও।'

সোমেন বলত, 'বার্লিটা আনি এখন?'

জয়া বলত, 'না থাক। একটু পরে।'

সোমেন বলত, 'ডাক্তার ডাকা নাহয়—সম্ভব হচ্ছে না, হাস-পাতালের সঙ্গে একটু যোগাযোগ করাতে আপত্তি করছ কেন? যাই না একবার?'

জয়া বলত, 'গলায় দড়ি আমার।'

কিন্তু যন্ত্রণাটাও তো চোখে দেখতে পারা যায় না এক এক সময়। কিছুটা উপশমের জন্যেও অন্তত:—'

'না।'

'তোমার চাষা ছেলে বলছিল, কী নাকি এক দৈব ওষুধের কথা জানে ও, এনে দিলে তুমি খাবে? না বোধহয় গলায় পরতে হবে, ঠিক জানি না। বলব গোবিন্দকে এনে দিতে?'

জয়া বলত, 'পাগলামী কোরো না।'

'আহা আমাদের না হয় বিশ্বাস নেই, জ্ঞানী-পণ্ডিত মানুষ আমরা, কিন্তু ওই অবোধটার বিশ্বাসের জোরে হয়তো—'

'কী? ক্যান্সার সেরে যাবে?'

'রোগটা তুমিই নির্ণয় করছ। ডাক্তার তো বলেনি ক্যান্সারই।'

'ডাক্তাররা রুগীর সামনে সব কথা বলে না।'

এই! এই তাদের কথাবার্তার নমুনা।

জোয়ারের সমুদ্রে ভাঁটা পড়তে পড়তে, বালির চড়ায় এসে থিতিয়ে থাকা শেষ অবশিষ্ট জলটুকু।

সোমেন যদি বা বলে, চেষ্টা করে, স্বভাববশে, জয়া বলে না। জয়ার কথা বলার শক্তি ফুরিয়ে যাবার আগে থেকেই জয়া আস্তে আস্তে থেমে গেছে। তারপর তো রোগই থামিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু আজ ভয়ঙ্কর একটা উত্তেজনায় জয়ার মধ্যে বুঝি আবার কথার ঢেউ উঠল।

অথচ সোমেন ভেবেছিল সুরথের আবির্ভাবে জয়া হয়তো একেবারে মূক হয়ে যাবে।

হয়তো বা পাশ ফিরে শুয়ে থাকবে ঘুমিয়ে থাকার ভানে। আর কি জানি হয়তো বা সেটা ভানও থাকবে না তার। সুরথের সঙ্গে চোখাচোখি হবার ভয়ে, চোখটা বুজেই ফেলবে চিরকালের মত।

কদিন আগে এসেছিল একবার সেই আশঙ্কার ছায়া, যার জন্যে হঠাৎ ওই চিঠিটা লিখে বসেছিল সোমেন।

কিন্তু কে জানত সত্যিই আসবে সুরথ।

মৃত্যু-সংবাদ শুনেও যে লোকটা মানবিকতার সামান্যতম প্রকাশের খাতিরেও পরলোকগতার আত্মার শান্তি কামনা করতে একছত্র লেখা খরচ করতে পারেনি, সে হঠাৎ তার 'মৃত্যুশয্যার' খবর শুনে একেবারে পত্রপাঠ চলে আসবে, এ-কথা কি ভাবনায় আসে?

তবু কল্পিত কল্পনায় ভেবেছে সোমেন সত্যিই যদি সেই অসম্ভব ঘটনা ঘটে সত্যিই সুরথ আসে তাহলে কী কী পরিস্থিতি হতে পারে।

কিন্তু কোনোদিন ভাবেনি, শুকনো বালির চড়ার ওপর আবার জোয়ারের জল এসে আছড়ে পড়বে। ভাবেনি জয়া এত কথা কইবে। জয়ার এত কথা কইবার ক্ষমতা আসবে।

সেই অভাবিত ভাবনাকে আরো বিস্মিত করে জয়া বলে ওঠে, আজেবাজে কী গো? মন্ত্রী-দপ্তরের কাজ ছাড়া আর সব আজে-বাজে? ওর এখন কী কী কাজ জান? ওর নিজেরই মত একটা

খোঁড়া গরু আছে, সেটাকে ঘাস-জল দেবে, তার তোয়াজ করবে, সে ছটাক খানেক দুধ দেবে এই আশায়। তারপর বাসন মাজবে, মহারাণীর ছাড়া কাপড় কাচবে, ঘর সাফ করবে, রান্না করবে—'দম ফুরিয়ে যাওয়ার জন্যেই কথা থামাতে হয় জয়াকে।

সুরথ কিন্তু ওই মুমূর্ষু রোগীটার দিকে তাকায় না, তাকায় সোমেনের দিকে। কেমন এক অদ্ভুত গলায় বলে, 'তবু বেঁচে থাকার সাধ? মরবার কোন উপায় খুঁজে বার করা যেত না?'

সোমেন হো হো করে হেসে ওঠে।

হেসে বলে, 'তা এটাকেই বা সাধের বাঁচা ভাবছিস কেন? ধরে নে মরারই একটা অভিনব পদ্ধতি। ছেলেবেলায় আমরা ঠাট্টা করে বলতাম, 'ছ' মাসের ফাঁসি।' এও তেমনি একটা কিছু। কিন্তু যাক ওসব কথা, দয়া করে যদি একটা রাতও থাকিস, রাতে অনেক গল্প হবে।'

'থাকবেন? ইনি? এখানে?'

জয়া আবার কথা বলে ওঠে, 'তোমার কি মাথাটা একদম খারাপ হয়ে গেছে সোমেন? কোথায় শুতে দেবে তুমি এই রাজা-রাজড়া মানুষকে। কি খেতে দেবে?'

দমটা কেবল বাদ সাধছে।

খালি খালি ফুরিয়ে ফুরিয়ে জব্দ করছে জয়া নামের মেয়েটাকে।

যে মেয়েটা একদা—এই দুটো মানুষের মাঝখানেই ঝলসাত, ঝলকাত, আর কথার তীর বিঁধে বিঁধে ঘায়েল করত।

কারো প্রতিই পক্ষপাত বোঝা যেত না। দুজনকেই ডাউন করে বিজয় গৌরবে জ্বলজ্বল করত।

তারপর কোনখানে কি ঘটতে থাকল, কোনখানে কি ভাঙা-গড়া চলতে লাগল, কোথাকার ঢেউ কোথায় গিয়ে আছাড় খেল।

সেটা কী ঘটেছিল, বিশ বছর ধরে তার হিসেব কষছে জয়া আর সোমেন নামের দুটো মানুষ। যেন জমা-খরচের হিসেব।

কিন্তু সুরথ ?

তার কি হিসেবের পালা সেদিনই চুকে-বুকে গিয়েছিল ?

কে জানে।

কিন্তু চুকেই যদি যাবে, আবার ওই বেহায়া মেয়েটা, যে নাকি তিল তিল করে শেষ হয়ে গিয়ে যমের রথে একখানা পা রেখেছে, সে আবার এই ছুটো পুরুষের সামনে ঝলসাবার শেষ চান্স পেয়ে গেল কী করে ?

তূণে এখনও তীর ওর।

সেই তীর নিক্ষেপ করল ভগবানের মার খাওয়া আধখানা মানুষটার দিকে, 'লজ্জা শব্দটার বানান যে জান না তুমি, তা জানি, কিন্তু চোখে কি এক পুরুও পর্দা নেই ?'

'জয়া তুমি আবার কথা বলছ—'

আস্তে বলেন সুরথ।

আশ্চর্য, এমন সহজ ভঙ্গীতে জয়া বলে ডাকতেও পারলেন ?

কী করে পারলেন ?

অন্ততঃ বিশ বছরের অনভ্যাসে জিভটা তো আড়ষ্ট হয়ে যাবার কথা।

সোমেনের অভ্যস্ত জিভ নামটা বার বার উচ্চারণ করল বলেই কি সহজ হয়ে গেল ?

নাকি এমনিই হয় ?

মুখোমুখি দাঁড়ালে সব পরিস্থিতিই সহজ হয়ে যায় ?

আর এই জন্যই মানুষকে 'মহাশয়' বলা হয় ?

তাই সুরথের মৃদু গম্ভীর গলায় স্নেহের শাসনের সুর।

সুরথ সেন যেন বন্ধুর বাড়িতে এসেছেন বন্ধু পত্নীর অসুখ শুনে। সুরথ সেন তাই ভাবছেন যে করেই হোক ওকে এই মৃত্যুকুণ্ড থেকে উদ্ধার করে নিয়ে গিয়ে জীবনের আশ্বাসের ঘরে পৌঁছে দিতে হবে। ওকে ভাল নার্সিংহোমে রাখতে হবে, উপযুক্ত চিকিৎসা করাতে হবে।

দেরী হয়ে গেছে, খুব দেরী হয়ে গেছে।

তবু মরবার জন্যেও একটু মানুষের মত পরিবেশের দরকার বৈকি

এই একটা ভিখিরির ঘরের মত ঘর থেকে জয়া মরে গেল, ওই হতভাগাটা কাঠের পা ঠুকে ঠুকে পাড়ার লোকের কাছে গিয়ে দাঁড়াল আবেদনের ভাষা নিয়ে, দোরের মড়া ফেলবার নীতিতে পাড়ার ক'টা ষণ্ডা গুণ্ডা ছেলে এসে তাড়ি খাওয়ার পয়সা আদায় করে জয়ার মৃতদেহটাকে টেনে নিয়ে গিয়ে কোন একটা অখ্যাত অবজ্ঞাত শ্মশানে পুড়িয়ে এল। এইটাই কি ভাবা যায়?

অথচ এই দৃশ্যটাই চোখের সামনে ভেসে উঠছে যেন।

এই দৃশ্যের ছবিটা সঙ্গে নিয়ে ফিরে যাবেন সুরথ সেন? গিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসবেন নিজের অভ্যস্ত আরামের জীবনে, 'আমার আর কী করবার ছিল, বলো?'

চোখ দুটো বার বার জ্বালা করছিল, তবু রুমাল বার করে ঘষতে পারা যাচ্ছে না, কথা বলতে গেলেও বোধহয় গলা কাঁপবে, তাই সুরথ সেন যতটা সম্ভব মৃদু গলায় বলেন, 'জয়া তুমি আবার কথা বলছ!'

এই কথার পর জয়া হঠাৎ শান্ত হয়ে গেল।

স্থির হয়ে তাকিয়ে রইল।

ওর নরম আর স্নেহের গলার স্নিগ্ধ ভৎর্সনা, তার জীর্ণ খাঁচাটার মধ্যে যে উত্তাল আলোড়ন তুলল, তা বোঝা গেল শুধু তার বিবর্ণ ঠোঁট দুটোর প্রবল কাঁপনে।

সোমেন বোধহয় এটা লক্ষ্য করেনি।

ওই ডাকটাও নয়, আর তার প্রতিক্রিয়াও নয়। তাই সোমেন জয়ার ব্যঙ্গ প্রশ্নের উত্তরটাই দেয়।

শান্ত গলায় বলে, 'সেবারে নর্থ বেঙ্গলে ফ্লাডের সময় আমরা যখন রিলিফের কাজে গিয়েছিলাম, তোমার মনে আছে, বাবুদের বাড়ির লোকেরা মেয়ে-পুরুষ নির্বিশেষে আমাদের লঙ্গরখানায় এসে লপসি

খেতে বসে গিয়েছিল? আর মেয়ে-স্কুলের সেই হেডমিস্ট্রেসটি দাতব্যের একখানা পুরনো শাড়ি পেয়ে আহ্লাদে কেঁদে ফেলেছিল? রাজা-রাজড়া হলেই যে দু একটা দিন রাত্তির গরীবের মত করে চালিয়ে নিতে পারবে না, এটা কোনো কথাই নয়। কিরে সুরথ, ডানলোপিলোর গদি ছাড়া একেবারেই শুতে পারবি না? আর পোলাউ মাংস ব্যতীত—'

হঠাৎ চুপ করে যায়।

সম্মুখবর্তী দুটো মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে কী দেখতে পায় কে জানে, আস্তে বলে, 'তা হলে তুই বোস ভাই, আমি ওদিকে—'

কাঠের ঠ্যাং দুটোয় যতটা সম্ভব সন্তর্পণে কম শব্দ তুলে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

বাইরে গিয়ে কান খাড়া করে রইল জয়ার সেই উঁচু গলাটা শুনতে পায় কিনা।

পেল না।

বুঝতে পারল না কি হল।

ক্লান্ত হয়ে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল?

নাকি আস্তে আস্তে কথা বলছে?

অথচ ওর দুটোর একটাও নয়।

ওরা শুধু পরস্পরের দিকে তাকিয়েছিল তখন।

হয়তো বা সেই শুধু তাকিয়ে থাকার মধ্যে ওরা ওদের কাল্পনিক দেহ দুটোকে আস্তে আস্তে পিছিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

মানুষের সৃষ্টিকর্তা যদি মানুষকে ওই পিছিয়ে যাওয়ার ক্ষমতাটা দিতেন, তাহলে যেখান থেকে আবার শুরু করা যেত, যেন সেইখানে পৌঁছে গেল ওরা।

সুরথ সেন তাঁর চোখের সামনে সেই অবয়বটি দেখতে পাচ্ছেন, যার সঙ্গে আজকের সুরথ সেনের যতটা না মিল, তার থেকে অনেক

বেশী মিল তাঁর অ্যালবামে আঁটা একটা ছবির সঙ্গে।

সেই চিরপরিচিত সত্ত-গ্র্যাজুয়েটের ছবি। ভাড়া-করা পোশাক পরা।

পুরনো অ্যালবামগুলোর কোনো চিহ্নই নেই আর, শুধু নতুন একটা অ্যালবামে যেখানে সুরথ তাঁর মা বাবা, আর ছেলেবেলায় মারা যাওয়া এক ছোটবোনের ছবি সেঁটে রেখেছিলেন, সেখানে ওটাকেও তুলে রেখেছিলেন।

রেখেছিলেন তাই বিশ্বাস করা যায় এস. কে. সেন নামের লোকটারও একদিন অনেকগুলো চুল ছিল।

অবশ্য সেই মূর্তিটার সামনে আর যে মূর্তিটা দীর্ঘ ঋজু দেহখানা নিয়ে উদ্ধত ভঙ্গীতে দাড়িয়ে রয়েছে, তার মত রুক্ষ আর ঝাঁকড়া নয়।

ওই রুক্ষ ঝাঁকড়া মাথা দীর্ঘদেহী মানুষটার পরনে ফর্সা ধবধবে খদ্দরের পায়জামা, আর গেরুয়া খদ্দরের পাঞ্জাবী, যে সাজটাকে সুরথ সেন বলতেন, 'ভণ্ড বিটেল'দের সাজ। বলতেন, 'ওই যে সাদা খদ্দরের পায়জামা আর গেরুয়া পাঞ্জাবী, এর আড়ালেই যত দুর্নীতি! চোরা কারবার, কালো কারবার, ঘুষ, লোক ঠকানো, এই সবকে আড়াল করবার সাজ।'

তর্ক করত জয়া।

বলত, 'তা' হলে তোমার মতে, তোমার মতন সুটে-বুটে টিপ্‌টপরাই যত নির্ভেজাল মহাপুরুষ? তোমার পোষাকটা হচ্ছে উচ্ছিষ্ট, ধারকরা বুঝলে? আর ওরটা হচ্ছে জাতীয় পোষাক।

সুরথ বলতেন, 'জাতীয় বলতে কী বোঝো তুমি? ওর পোষাকটা তো বাঙালীর নয়।'

'ওঃ বাঙালী। বাংলা বিহার উৎকল পাঞ্জাবের হিসেব। ওর মনের গণ্ডি অত ছোট নয়, বুঝলে? ও ভারতবর্ষকে অতো টুকরো টুকরো করে দেখে না। অখণ্ড ভারতের মূল সূত্রটি বজায় রেখে ও

ওই পোষাক বেছে নিয়েছে।’

সুরথ বলতেন, ‘আর আমি যদি বলি আমার মনের গণ্ডি আরো বড় আরো বিরাট। সমস্ত বিশ্বের মধ্যে একটি ঐক্যের সুর খুঁজে পাই আমি। তাই আমার কাছে বিশেষ একটি দেশের পোষাকই জাতীয় পোষাক নয়, সারা পৃথিবীর যে কোনো দেশের পোষাকই আমার—’

জয়া এ ধরণের কথাকে এগোতে দিত না। ঝাপটা মেরে উড়িয়ে দিত।

তখন সুরথ সোমেনকে ডেকে বলতো, ‘ছাখ সোমেন, আমার বৌ যে-ভাবে তোকে সাপোর্ট করছে, মনে হচ্ছে ঈর্ষা করতে করবো কি না।’

সোমেন বলতো, ‘করতে পারিস। ঈর্ষা-টির্ষার ব্যাপারে কোন কারণ না থাকলেও করা চলে। তবে মহিলারা চিরদিনই দুর্বলের পক্ষ নিয়ে থাকেন তাই এই সমর্থন।’

‘পক্ষটা দুর্বল, এটা প্রমান হবে কিসে?’

‘হবে সব ব্যাপারেই! তুই ধনে-মানে কুলে-শীলে কৃতীত্বে প্রতিষ্ঠায় একেবারে জ্বল-জ্বলাট। আর আমি? একটা হতভাগ্য বাউণ্ডুলে, তোর আশ্রিতও বলা চলে।’

‘এবার কিন্তু রেগে যাব।’

বলতো সুরথ।

হয়তো বন্ধুকে একটা থাপ্পড়ও বসিয়ে দিত।

কিন্তু ক্রমশঃ সে পরিস্থিতির বদল হতে লাগল। ক্রমশঃ জয়াকে যেন বেহুঁশ বেতালা এক বগ্‌গা একটা ঘোড়া মত দেখতে লাগতো।

যেন চক্ষুলজ্জা বলে শব্দটা ওর অভিধান থেকে মুছে গেছে।

সোমেন কিন্তু তখন, মানে জয়ার সেই দৃষ্টিকটু বেপরোয়ামি দেখে মাঝে মাঝেই ওয়ার্নিং বেল দিয়েছে।

বলেছে, ‘ছাখ সুরথ ইচ্ছে করে তুই খাল কেটে কুমীর আনছিস।

এখনো সাবধান হ। তোর বৌ যে আমার প্রেমে পড়তে বসেছে এটা প্রায় অবধারিত হয়ে আসছে। অথচ তুই নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছিস।'

কিন্তু সত্যিই কি সুরথ নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছিল তখনো? সুরথ কি তার বেপরোয়া বৌকে বিভ্রান্তির পথ থেকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করেনি? পারছিল কই?

জয়া ওকে সেকেলে গাঁইয়া, সন্দেহ বাতিক গ্রস্ত, অনেক কিছু বলে প্রায় নস্যাৎ করে দিত। আর জয়া সুরথের ওই চেষ্টার ফলে আরো বাড় বাড়তো।

যেন ওটা একটা মজা।

নিয়ে যেন তরওয়ালের ওপর দিয়ে হাঁটার কৌশল তার রপ্ত।

নয়। সোমেনও চেষ্টা করেনি তা নয়।

করেছিল চেষ্টা।

কাজ হয়নি।

জয়ার বাসনার বেগ সে চেষ্টাকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে।

অথবা হয়তো সেই চেষ্টাটার মধ্যে সত্যতা ছিল না। হয়তো নিজেকে ভোলাতেই সোমেন অনবরত সাফাই গেয়েছে।

তাই হঠাৎ কোনোদিন নিঃশব্দে চলে না গিয়ে (যেটা শোভন হতো সঙ্গত হতো) বন্ধুকে ডেকে ডেকে বলেছে, 'এখনো তুই আমাকে গলা ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বার করে দিবি না? নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরে পা খোয়াবি? ওরে মুখ্যু টাকা আর সুন্দরী স্ত্রী, এ দুটো বস্তুর ব্যাপারে যে পরম বন্ধুকেও বিশ্বাস করতে নেই। এই শাস্ত্রবাক্যটা শুনিস নি কখনো?'

'না শুনে থাকিস তো তার ফল ভোগ। আমি কি করবো। আমি তো একটা হতভাগ্য বন্ধু, আমার যদি মেসের ভাত খেতে খেতে ডি-সেন্ট্রাই ধরে থাকে—কী লোকসান হচ্ছিল পৃথিবীর? তা নয় তুই গেলি মহত্ব করে আমায় নিজের অন্দরে প্রতিষ্ঠিত করতে।...

এখন বেনোজল ঢুকে ঘরের জল না বার করে নিয়ে যায়।'

মনে হতো ঠাট্টা করছে।

কিন্তু ঠাট্টার স্টেজ কি ছিল তখনও?

উত্তরবঙ্গের কোনখানটার যেন প্রবল বন্যা হল, ঘর-বাড়ি জরু গরু সবস্ব ভেসে গেল লোকের, সোমেন সেই সময় রিলিফের কাজে যাবার হুজুগে মাতল।

কোন কোন সব দলের সঙ্গে জুটে রাস্তায় গান গেয়ে ঘুরে 'সাহায্য' সংগ্রহ করল, সেই সাহায্য ভাণ্ডার সেখানে বয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থাপনায় আহার নিদ্রা ভুলল।

আর সেই সময় জয়া ধরে বসল, সেও রিলিফের কাজে ওদের সঙ্গে যাবে।

জয়া যাবেই উত্তরবঙ্গের সেই বন্যা বিধ্বস্ত জায়গা পরিদর্শন করতে।

এই অর্থহীন জীবনের বোঝা টেনে চলতে আর পারছে না সে।

কাজ চাই তার।

বড়লোকের গিন্নীর যে কাজ, ঘর সাজানো টেবিল সাজানো, সমাজ সামাজিকতা রক্ষা, সে কাজ নয়।

চায় নতুন কাজ, নতুন ধরনের কাজ।

এই রিলিফের কাজ জয়াকে প্রেরণা দেবে, প্রাণ দেবে। জয়া এ সুযোগ ছাড়বে না।

প্রথমটায় সুবধ উড়িয়ে দেওয়ার বিশ্বাস নিয়ে বলেছিল, 'পাগলামী কোরো না।'

জয়া তীক্ষ্ণ হাসি হেসেছিল।

বলেছিল, 'যে সব আধমরা পৃথিবীতে কোনো ভাল কাজ করতে চায় তোমাদের মত স্যুটে-বুটে সুশোভিত সুস্থমাথা লোকেরা তাকে পাগলই বলে।'

অনেক তর্ক অনেক কথার জাল রচনা, তারপর এল সেই ক্ষণ।

যে ক্ষণটুকুর ঠিক আগের মুহূর্তটি গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে পারলে তিন তিনটে মানুষের জীবনের চেহারা অন্যরকম হতো।

সেই ক্ষণটুকু কিন্তু দেখতে কেমন সুন্দর ছিল।

সকালের রোদ এসে পড়েছিল বারান্দায়, আলোয় ভরে গিয়েছিল। ঘর দালান বারান্দা, পাথরের টেবিলে সোনালি পেয়ালায় চা নিয়ে বসেছিল ওরা, জয়া হঠাৎ বলে উঠল, 'আমরা তাহলে কখন বেরোচ্ছি সোমেন ?'

হঠাৎ একটা হাতুড়ির আঘাতের মত এই প্রশ্নটায় জয়ার স্বামী তো চমকে উঠলই, জয়ার স্বামীর বন্ধুও চমকাল।

সোমেন এ প্রশ্নের জন্যে তো প্রস্তুত ছিল না।

ব্যবস্থা তো অন্য হয়েছিল।

হয়তো নেহাত দৃষ্টিকটু হবে বলেই এই দ্বিতীয় ব্যবস্থা। রিলিফের কাজে একদল মেয়ের যাবার কথা, সেটা ক'দিন পরে। ছেলেরা আগে গিয়ে অবস্থা পরিদর্শন করে বুঝবে মেয়েদের গিয়ে কাজ করা আদৌ সম্ভব কি না।

কিন্তু জয়া ওই মেয়েদের দলের নয়, জয়া ছেলেদের দলে। প্রথম অভিযানের গৌরবের শরীক না হতে পারলে আর অভিযানের অর্থ কি ?

জয়া কেন মেয়েদের দলে যাবে, জয়া কি ওই মেয়েগুলোর মত নেহাত মেয়ে ? জয়ার মত এত সুন্দরী, এমন বিদূষী, এত বাকপটু, এমন ঝকঝকে আর এত প্রখরবুদ্ধিসম্পন্ন সাহসী মেয়ে আর কেউ ছিল সে দলে ?

তাই জয়ার ব্যবস্থা ছিল প্রথম যাত্রায়।

কিন্তু দ্বিতীয় ব্যবস্থায় বদলালো ওটা।

জয়াকে যেহেতু মেয়ে না বলে উপায় নেই, তাই ওই দ্বিতীয় চিন্তা।

অসুবিধে সুবিধের প্রশ্ন নয়, সত্যিই বড় বেশি দৃষ্টিকটু হবে

একপাল পুরুষের সঙ্গে একটি চোখ-ঝলসানো মেয়ে।

তাছাড়া সুরথ সম্পর্কে জয়া না ভাবুক, সোমেন হয়তো ভেবেছিল। হয়তো ভেবেছিল বার্স্ট করা পর্যন্ত পাম্পটা না চালানোই তো ভাল! দু'দিক বজায় থাক না। সেই কথাই ঠিক ছিল অতএব।

কিন্তু এখন জয়া বলে উঠল, 'আমরা তাহলে কখন বেরোচ্ছি সোমেন?'

সোমেন হযতো বুঝল তার দুদিক বজায় রাখবাব দিন ফুরিয়েছে। সোমেন বলিদানের জন্যে প্রস্তুত হল। হাড়ি-কাঠে মাথা রাখল।

বলল, 'ওই তো বেলা দশটায়।'

'ও আচ্ছা। তাহলে চটপট ঠিক হযে নিই।'

হঠাৎ সুরথ চেয়ার ঠেলে দাঁড়িয়ে উঠল। কড়া গলায় বলল, 'তোমার যাওয়া হবে না।'

'হবে না?'

জয়া খিল খিল করে হেসে ওঠে। বলে, 'হঠাৎ যেন মধ্যযুগীয় প্রভু-স্বামীর গলা শুনতে পাওয়া গেল তোমার গলায়!'

'তোমার অনেক বাচালতা সহ্য করেছি, এবার স্টপ! সোমেন, তুমি একলা যাবে।'

সোমেনও উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'হ্যাঁ, আমিও তাই ভাবছি। আর এই যাওয়াটা চিবকালেব জন্যেই হবে।'

সুরথ আর বলল না, পাগলামী করিস না, বলল না, এখানে যদি তোর কিছু অসুবিধে হয় সেটাই বল।

সুরথ বলল, 'ঠিক আছে। আর সেটাই বোধহয় ঠিক হবে।'

তারপর ওরা কথার লড়াইয়ে নামল। তূণের মধ্যে যা ভরা ছিল, তা বার করল।

সোমেন বলল, 'এই ঠিকটা আরো আগেই ভাবা উচিত ছিল। আমি তো বার বার বলেছি, আমায় ছেড়ে দে। আমি কেন তোদের

গৃহবিবাদের কারণ হই। তুইই আহাম্মুকের মত—'

'ভুল হয়েছিল। মানুষ যে চারপেয়ে জন্তু, এ খেয়াল হয়নি।'… কথার পিঠে কথা, আরো কথা। এই কথার মাঝখানে জয়া কখন যেন উঠে গেল।

তারপর ছোট্ট একটা স্যুটকেস হাতে নিয়ে এসে স্বাভাবিক গলায় বলে উঠল, 'চল সোমেন, দেরী হয়ে যাচ্ছে।—হ্যাঁ তুমি শোন, চাবিপত্তর যা কিছু আমার হেফাজতে ছিল সব টেবিলের ওপর রইল, ব্যাঙ্কের পাসবই, চেকবই সব কিছু ওই চাবিতেই পাবে। আচ্ছা চলি!'

সোমেন অস্ফুট গলায় কি একটা বলল, যার অর্থ বোধহয়, এই দণ্ডেই বেরোবার দরকার কি? এখনও তো সময় আছে।

জয়া হেসে উঠল, 'নাঃ সোমেন, সময় আর আদৌ নেই। বরং সময়টা অনেক পার হয়ে গেছে। হ্যাঁ, সোমেন চিরতরেই যাবে, তবে একলা নয়। এই ভেঙে যাওয়া খেলাঘরে ভাঙা পুতুল কুড়িয়ে খেলা করার সাধ আর নেই আমার।' তারপর—

রোদে ভর্তি সকালবেলা স্বামীর সামনে দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল জয়া পরপুরুষের হাত ধরে।

অনেক আধুনিক নভেল পড়া ছিল জয়ার, বিদেশী সাহিত্য খেয়েছে গুলে, তাই এই যাত্রাকালে কথা যোগাতে অসুবিধে হয়নি জয়ার।

অনেক ভাল ভাল কথা তার মুখস্থ।

সোমেনের এক্ত নয়। তাই সোমেন শুধু বলেছিল, 'ভেবে দেখছি, এই অবস্থায় এ ছাড়া আর কোনো সলিউশন নেই।'

না, ওরা সেদিন বুঝেছিল, যে অবস্থা তারা এতোদিন নির্ভয়ে বসে বসে সৃষ্টি করেছিল, সে অবস্থার ওইটা ছাড়া আর কোনো সলিউশন নেই।

আর আজ এই উনিশ বছর পরে, আবার সেই কথাটাই বলল সোমেন।

'নারে ভাই, আমি আর ওর প্রাণটাকে আরও কিছুদিন ভাঙা খাঁচাখানার মধ্যে আটকে রাখার জন্যে ব্যস্ত হইনি। দেখছি—মৃত্যুটাকে মেনেই নিতে হবে, মৃত্যু ছাড়া এ অবস্থার আর কোনো সলিউশন নেই।'

কিন্তু সেদিন যদি সুব্রত ওর জীবনের ওই ভেসে-যাওয়া নৌকোখানাকে জোর করেই চেপে ধরত! নোঙরের কাঁটায় আটকে রাখত।

তাহলে আজ আবার একবার ওই কথাটা শুনতে হতো না।

কিন্তু যেহেতু জীবন-গ্রন্থের ছাপার ভুলের প্রুফ কারেকশান নেই, তাই শুনতে হল আর একবার।

তখন জয়া ঘুমের ওষুধের প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে ঘুমোচ্ছে, পাশের ঘরে দুটো আকাশ-পাতাল অবস্থার পুরুষ একই চৌকিতে জেগে বসে রাত কাটাচ্ছে।

ওরাও আচ্ছন্ন। কথার প্রভাবে।

একদার দুই একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু আবার আগের মত মুখোমুখি বসেছে মাঝখানের পার হয়ে আসা দুস্তর কাঁটাবনের স্মৃতিটা বিস্মৃত হয়ে।

যখন জয়া জেগে ছিল, ওরা খুব অনায়াসে ওদের ছাত্র-জীবনের গল্প করছিল।

বলছিল, 'তোর মনে আছে সুব্রত, একবার আমরা ঠিক করেছিলাম, ভুলে যদি কেউ কাউকে 'তুই' বলে ফেলি, এক আনা করে ফাইন। এখনকার মত ছ'নয়া পয়সার আনা নয়, গোলগাল একটি আনি তো? আমরা সবাই আনি হাতে এলে কক্ষণো খরচ করতাম না, পকেটে রেখে দিতাম। আর যারই ফাইন হোক, সেই আনিটা দিয়ে সকলে মিলে চিনেবাদাম খাওয়া হতো।'

জয়াকে শোনাবার জন্যেই ওদের এই গল্প! যদিও জয়া অনেক

দিন আগে এসব শুনেছে। কিন্তু জয়ার উপস্থিতি সত্বেও তুই বন্ধুতে বিভোর হয়ে গল্প করার দৃশ্য দেখে রাগে জ্বলেছে বলেই কান করেনি তখন।

আজ কান পেতে শুনল।

যেন কোনো স্বর্গভূমির কথা শুনছে, এমনি একটা আগ্রহে জ্বলজ্বল প্রসন্ন মুখ নিয়ে।

জয়ার সঙ্গে তখন রফা হয়েছে, ওকথা বলবে না, শুধু শুনবে।

সুরথ বলেছে, 'এখন শুনলে লোকে হেসে উঠবে, কিন্তু এক আনার বাদাম আমরা ছ'সাতজনে মিলে খেয়েছি।'

'তারপর খোসা হাতড়েছি—' বলে হো হো করে হেসে উঠেছে সোমেন।

অনেকক্ষণ পরে জয়াকে ঘুমের ওষুধ খাওয়ানো হল।

সোমেন বলল, 'এই একটা মাত্র ওষুধই যে করেই হোক যোগাড় রাখতে হয়। নইলে এক একদিন যন্ত্রণা চোখে দেখা যায় না।'

জয়া ঘুমোলে সুরথ দৃঢ়স্বরে বলেছে, 'কালই ওকে হাসপাতালে নেওয়াতে হবে। সে ব্যবস্থা করে তবে আমি যাব।'

'একদিনের মধ্যে কি হয়ে উঠবে? তোমার তো আর কাজ ফেলে—'

'কোন কাজটা যে সত্যি দরকারী, সেটা বুঝতে না শিখেই, আমাদের জীবনে এত বিশৃঙ্খলা সোমেন। সেদিন যদি বুঝতাম কাজে চলে যাওয়ার থেকে অনেক বেশী দরকারী ছিল জয়াকে আটকানো, তাহলে হয়তো—' একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলেছে, 'একদিন কেন, একঘণ্টার মধ্যেও অনেক কিছু হওয়ানো যায় সোমেন, যদি 'সবখোল' চাবিকাঠিটি পকেট থেকে বার করা যায়।'

'কিন্তু জয়া কি হাসপাতালে যেতে রাজী হবে?'

'রাজী করাতেই হবে। এখন ভিখিরির মত ওকে যেতে দিতে পারা যাবে না সোমেন।'

'ওর এই অবস্থার জন্যে আমিই দায়ী', সোমেন উদাস উদাস গলায় বলে, 'কিন্তু ওর মানসিক অবস্থার চেহারা যদি দেখতিস! মৃত্যু ছাড়া ওর আর কোনো সমাধান ছিল না।'

'কিন্তু ও তো ইচ্ছে করেই ঘর ছেড়েছিল সোমেন। হয়তো তোর সঙ্গেই ওর মনের সুরে মিলেছিল—'

না আর ঈর্ষা নেই, তীব্রতা নেই—ওরা যেন একটা গভীর সমুদ্রের তীরে এসে বসেছে। যে সমুদ্রে তরঙ্গ নেই।

ওরা ওদের আশৈশবের বন্ধুত্বের স্মৃতির মধ্যে ডুবে গেছে। যে বুদ্ধিহীন মেয়েটা ভুল করে বুদ্ধির অহঙ্কারে স্ফীত হয়ে ওদের দুজনের জীবনটা ভেঙে দিল, তার ওপর আর রাগও নেই ওদের।

যেন একটা অবোধ শিশু না বুঝে ওদের ঘরে আগুন লাগিয়ে ফেলেছিল, কী আর করতে পারে সেই শিশুটিকে।

সোমেন মৃদু হেসে বলে, 'ওইখানেই আসল ট্র্যাজেডি রে সুরথ। কোনোদিনও আমার মনের সঙ্গে ওর মনের সুর মেলেনি। সে প্রশ্নই ওঠে না। ঘর ছেড়েছিল ও, অনুরাগে নয়, রাগে। আমার সঙ্গে তোর যে একান্ত বন্ধুত্ব এটা ওর বরদাস্ত হতো না। ও রেগে জ্বলত। যখন আমরা তিনজনে একসঙ্গে ছিলাম, ও আমায় বলত, তোমার ওপর আমার সতীনের হিংসে। আমার বরের মনটা আমি সবটা পাচ্ছি না তোমার জন্যে, তুমি ওর দৃষ্টিটাকে আড়াল করে রেখে দিয়েছ।'

'সে কথায় যে গুরুত্ব দেবার দরকার আছে বুঝতাম না ভাই। হেসে হেসে বলতাম, বেশ তো ক্ষমতার লড়াইয়ে নামো। আড়ালকে উড়িয়ে দাও।'

'ও বলত, নাঃ। অমন সোজাসুজি লড়াইয়ে আমি নেই, ওটা গ্রাম্য, ওটা সেকেলে। ওর কাছ থেকে তোমায় উড়িয়ে দেব পরীর ডানার ঝাপট দিয়ে।'

'সেকথার মানে বুঝতাম না।'

'তারপর ক্রমশঃ মানে বুঝলাম।'

'তোর হৃদয়টা পুরো দখলে আনবার চেষ্টা না করে, জয়া আমাকে দখলে আনবার জন্যে উঠে পড়ে লাগল। আমার কাছ থেকে তোকে ছিনিয়ে না নিয়ে, তোর কাছ থেকে আমায় ছিনিয়ে নিল।'

'কিন্তু শুধুই কি তাই?' সুরথ একটু হাসেন। 'তোর মধ্যে কি কিছুই—'

'সেকথা অস্বীকার করব কোন মুখে? আমার মধ্যে তো পরম দুর্বলতা। তবু তোর কাছে অবিশ্বস্ত হওয়ার যন্ত্রণাও তিল তিল করে কুরে কুরে খেয়েছে। অথচ নিজেকে রক্ষা করতে পারছি না।...সেই যন্ত্রণার দোটানায় পড়ে ছটফট করেছি, উপায় খুঁজে পাইনি। ক্রমশঃ তোর ওপর রাগ হতে লাগল। তোকে একটা অপদার্থ কাপুরুষ মনে হতে লাগল। ভাবতে শুরু করলাম, যে লোক নিজের ঘর সামলাতে পারে না, নিজের স্ত্রীকে মুঠোয় রাখতে পারে না, তার এই শাস্তিই হওয়া উচিত।...আমি জানি জয়াও ঠিক এই রাগেই নিজের জীবনটা ধ্বংস করল। আর আমি সেই ধ্বংসস্তূপ আগলে বসে আছি এই বিশ বছর ধরে।'

'নিজেও বরবাদ হয়ে গেলি।' বলল সুরথ।

'আমাকে তো—'দিব্যি হেসে উঠল সোমেন, 'ভগবান মেরেছে।'

'নিজেকে বড় বেশি অপরাধী মনে হচ্ছে।' সুরথ বলেন, 'মনে হচ্ছে এই সব কিছুর জন্যে আমিই দায়ী। আমি যদি—'

'তোর তো কিছু করার ছিল না, সুরথ।'

'ছিল বৈ কি।' সুরথ আস্তে বলেন, 'আমি তোদের খোঁজ খবর নেবার চেষ্টাও করিনি।'

সোমেন মমতার গলায় বলে, 'আহা তোকে তো মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়ে রেখে দেওয়া হয়েছিল।'

'হ্যাঁ, তা হয়েছিল।'

সুরথ অন্যমনার মত বলেন, 'আর আমি সেই সুযোগটি লুফে

নিলাম দিব্যি, আর একখানি বিয়ে করে সংসার পাতিয়ে বসলাম।'

'তা আর কি করবি বল।' সোমেন হাসে, 'শুধু আমিই চিরদিন তোর ঘর থেকে ডাকাতি করে আনা, অমৃতকুম্ভের বোঝা বয়ে মলাম।'

আস্তে আস্তে বলল অনেক কথা সোমেন।

উত্তরবঙ্গের সেই ত্রাণকার্যের নেশায় প্রথমটা খুব উল্লাসের মূর্তিতে ছিল জয়া। যেন খুব একটা বড় লড়াইয়ে বিজয়িনী হয়েছে। সেই বিজয় গৌরবটিকে চোখ চেখে উপভোগ করবার জন্যে পেখম মেলে বেড়িয়েছে, সোমেন নামের লোকটাকে নাকে দড়ি দিয়ে নিয়ে ঘুরিয়েছে। তাকে কোনো একটা জায়গায় দশটা দিন তিষ্ঠোতে দেয়নি।

তারপর আস্তে আস্তে বুঝতে পেরেছে নিজের ভুল। বুঝেছে স্বামীকে ও কী প্রবল ভাবে ভালবাসে।...তখনই সোমেন নামের অসহায় জীবটাকে পীড়ন করার শুরু।

অথচ মায়া-মমতাও আছে প্রচুর।

সোমেন বলে, 'নিজের মনের সঙ্গেই ওর অহরহ যুদ্ধ। তবু জোর করে কাজে মন বসাতে চেষ্টা করল—'

হ্যাঁ, এই সময় দুজনে মিলে ঘুরেছে গ্রামে গ্রামে, গ্রাম-সেবার চেষ্টা করেছে। সরকারের কাছে সাহায্য আদায় করবার জন্যে প্রাণপাত করেছে।

'কিন্তু জানিসই তো পল্লীসমাজের ব্যাপার?' সোমেন হেসে বলে, 'যাদের সেবা করি তারাই সন্দেহের চোখে দেখে। আমাদের ওই উন্নয়ন-টুন্নয়ন সবই যে ভণ্ডামী সরকারী টাকা থেকে খাবল বসিয়ে নিজেদের পকেট ভরাবার ফন্দী—এটা ওরা এত বেশি বুঝতে লাগল যে, নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে গিয়ে সরকারের দপ্তরে আমাদের নামে লাগিয়ে এসে ওই সাহায্য-ফাহায্যগুলো বন্ধ করে ফেলল। তাছাড়া

—গ্রামের ওই লোকগুলো বোকা হলে কী হবে, ভীষণ চালাক। আমরা যে দুজন কাজ করে বেড়াচ্ছি, তারা যে ঠিক সামাজিক জীব নয়, আমরা যে মিথ্যে পরিচয় এঁটে লোক ঠকাচ্ছি, এটাও বুঝে ফেলতে লাগল এক নিমেষে।...কাজে কাজেই বুঝতে পারছিস, এ গ্রাম থেকে ও গ্রাম, এ পাড়া থেকে ও পাড়া।'

'অবশেষে এইখানে জয়া একটা মেয়ে-স্কুলে চাকরী নিয়ে কিছুদিন একটু স্থির হয়ে বসেছিল, তারপর তো আমার এই পা গেল, আর ও রোগে পড়ল। বলতে গেলে অনশনের ওপর দিয়েই—'

হঠাৎ চোখ দুটো লঙ্কার ঝাঁজ লাগার মত জ্বালা করে ওঠে সুরথের।

ধরা গলায় বলেন, 'অথচ আমরা এক সময় বন্ধু ছিলাম সোমেন—

'আজও আছি।'

সোমেন আস্তে ওর হাতটার ওপর একটা হাত রাখে।

'আছি?' সুরথ চেঁচিয়ে ওঠেন 'বাজে কথা বলে ঠকাতে এসেছিস আমায়? আজও আছি! তাই আমি রাজসূয় ব্যবস্থায় খাচ্ছি থাকছি, আর তুই—'

থেমে যান।

সোমেন আর কথা বলে না।

শুধু সেই হাতটাতেই একটু নিবিড় ভাবে চাপ দেয়।

মরার সময়টুকুও অন্ততঃ রাজরাণীর মত মরা হল না জয়ার।

পরদিন সকালেই মারা গেল সে, এই দীনহীন শয্যায়।

ভোরের দিকে তখনও ভাল ছিল।

অনেক ঘুমিয়ে ভালই দেখাচ্ছিল।

জ্ঞান হারায়নি. সুরথের দিকে তাকিয়ে খুব আস্তে কিন্তু হাসির মত করে বলল, 'ক্ষমা চাওয়ার ধাষ্টামো আর করব না। তুমি এমনিই আশীর্বাদ কর। যেন আসছে জন্মে বুদ্ধিটা ভাল নিয়ে জন্মাই।'

তারপর থেমে, জল খেয়ে বলল, 'জানি তোমায় বলার দরকার নেই, তুমি ওকে দেখবেই। তবু আমি একবার কর্তব্য করে চলে যাই, তুমি ওর ভার নিও। ওকে নিয়ে আমি এতকাল ডাংগুলি খেলেছি। বড় কষ্ট পেয়েছে বেচারা।'

তবু তখনো ওরা ভাবেনি ঘণ্টা দুই পরেই প্রদীপটা নিভে যাবে। ওরা ডাক্তারের ব্যবস্থা করার তোড়জোড় করছিল।

হঠাৎ বদলে গেল অবস্থা।

যন্ত্রণায় নীল হয়ে গেল জয়া।

সুরথ ছটফটিয়ে 'ডাক্তার ডাক্তার' বললেন! সোমেনই থামিয়ে দিল।

বলল, 'থাক সুরথ, অনেকদিন ধরে এই দিনটির প্রতীক্ষা করছে, শান্তির সঙ্গে যেতে দাও ওকে।'

'এই ভাবে এতগুলো বছর কাটিয়েছিস তোরা!' নিঃশ্বাস ফেলেন সুরথ সেন।

'কী অপচয়, কী অকারণ অপচয়।'

সোমেন জয়ার যন্ত্রণায় নীল হয়ে যাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে আস্তে বলে, 'তবু যাবার আগে জেনে গেল সমুদ্র শুকোয় না।'

সুরথ জয়ার বিছানার ধারে বসে পড়লেন, বললেন, 'জয়া, কিছু ইচ্ছে করছে?'

জয়া চোখ দুটো টেনে খুলল।

মরণ নীল মুখটায় যেন দুষ্টুমীর ছাপ আঁকল, বলল, 'তোমার বৌকে দেখতে ইচ্ছে হতো। সে তো দিল্লীতে—'

সুরথ গম্ভীর ধরা গলায় বলেন, 'আমার বৌ এখানেই আছে জয়া। বৌ একজনই হয়, বিয়ে একবারই হয়।'

আবার রাত্রের গাড়িতে ফিরছেন সেনসাহেব।

নিঃসীম অন্ধকার, বাইরেটা দেখা যাচ্ছে না, জানলায় পর্দা ঢাকা।

তবু অনুভব করতে পারছেন ভয়ঙ্কর বেগে দৌড়ে দৌড়ে দূরে সরে যাচ্ছে গাছ-পালা মাঠ-বন পাহাড়-নদী। এ গাড়ি খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে দেবে তাঁকে তাঁর চিরাভ্যস্ত পরিবেশে।

সেনসাহেব এসে নামা মাত্র বাড়িতে সাড়া পড়ে যাবে, চাকর বেয়ারা ছুটে আসবে। আর বাড়ির কর্ত্রী এসে বিরক্ত গলায় প্রশ্ন করবেন, 'হঠাৎ তোমার কী হল বল তো? কোথায় ছিলে এই দু'দিন? কলকাতা অফিস থেকে ট্রাঙ্ক কলের পর ট্রাঙ্ক-কল।... থানায় ডায়েরি, ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ খবর চলে গেল—যে অবস্থাতেই পড়, একটা খবর তো দেবে।'

সেনসাহেবকে অবশ্যই বানিয়ে কিছু বলতে হবে।

হঠাৎ একটা বেপোট জায়গায় অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন বলবেন?

নাকি গুণ্ডাদের হাতে পড়ে আটক থাকতে হয়েছিল?

এ কথাটা আজকালকার দিনে কেউ অবিশ্বাস করবে না। গুছিয়ে বলতে পারলে—

কিন্তু কী ভাবে গুছিয়ে? কোন পরিস্থিতি খাড়া করে বিভার এবং বন্ধুবান্ধবের হাত থেকে আত্মরক্ষা করবেন, সেটা আর এখন গুছিয়ে ভেবে রাখতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

হবে যা হয়।

গাড়ি থেকে নামার পর হবে।

এখন শুধু এই রাত্তিরটুকুকে চেখে চেখে উপভোগ করতে পারেন তিনি, হাতের মুঠোয় ভরে অনুভব করতে পারেন।

ইচ্ছে মত কল্পনা করতে পারেন, অনেক দিন আগে যেদিন জয়ার মৃত্যু-সংবাদটা শুনেছিলেন, আজ যেন সেই দিনটা। সেনসাহেব সেই সংবাদ শুনে ছুটে গেলেন, (মানে মৃত্যু সংবাদ শুনলে ছুটে যাওয়াই তো বিধি) আর গিয়ে দেখলেন, খবরটা স্রেফ্ ভুয়ো।

তখন?

তখন জয়াকে জোর করে কেড়ে নিলেন সোমেনের কাছ থেকে।

যাচ্ছেতাই করে গাল দিলেন সোমেনকে। বললেন, 'এই দু'বছরেই এই হাল করেছিস? জানিস, জয়া আমার কাছে কী আরামে যত্নে থাকে? যখন দেখতে পাচ্ছিলি খেতে দিতে পারছিস না, তখন মাথায় করে বয়ে নিয়ে গিয়ে দিয়ে আসতে পারিসনি আমায়?'

নিয়ে এলেন।

বললেন, 'জয়া, শখ মিটেছে তো?'

দিল্লীর সেই বাড়িটায় এসে—

না, সে বাড়ি নয়, তখন সেনসাহেবের বাড়ি অন্যত্র। আর একটু মধ্যবিত্ত পাড়ায়।

সে বাড়িতে 'বিভা' নামের কোনো দুরন্ত অস্তিত্ব ছিল না।

সেই বাড়িতে এনে নামলেন, নামালেন জয়াকে।

বললেন, 'ছটফটানি থামিয়ে এবার ভালভাবে সংসার করো দিকি। আর ছেলেমানুষী করে না।'

জীবন শুধু এগিয়েই চলে, পিছু হাঁটতে জানে না, এ কথা খুব বেশী করে জানলেও, আজকের এই সম্পূর্ণ নিজস্ব রাতটুকুকে ভোগ করতে করতে সেনসাহেব তো আবার জয়াকে নিয়ে সংসার করতে পারেন।

খুব আহ্লাদে, আনন্দে, ক্ষমায়, প্রেমে।

আর—

আর সেই হতভাগ্য লোকটা।

দুখানা পা-ই যার কাটা পড়েছে মানুষের 'ভালবাসা'র বহরে।

সে লোকটা তখনো দু'খানা পায়ের ওপরই চলছে পৃথিবীকে মাড়িয়ে মাড়িয়ে। তার সেই আস্ত চেহারাটা ভাবতে চেষ্টা করলেন।

ভেবে ভেবে তাকেও টেনে নিয়ে এলেন সেই একটু 'কমা' বাড়িতে।

তাকে বলছেন, 'এবার তোকে মারতে মারতে কোনোখানে কাজে জুতে দেব রাস্কেল। অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা। তা নইলে কিনা এতদিন ধরে যার খেলি তার বৌকে নিয়ে পালালি?'

এই গাড়ি-ভর্তি ঘুমন্ত মানুষের মধ্যে একা জেগে জেগে যদি স্বপ্ন দেখেন সুরথ সেন নামের মানুষটা, কার কি ক্ষতি?

ক'ঘণ্টা পরেই তো স্বপ্নটা ভেঙে যাবে।

জেরার মুখ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে নিয়ে ফের সেনসাহেব হয়ে যেতে হবে।

কিন্তু সেই খটখটে কাঠের পা-ওলা লোকটার কী হল?

মারবার সময় জয়া যার ভার দিয়ে গেল সেনসাহেবের ওপর?

তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন না যে?

দূর! তাই কি হয়!

কল্পনায় যা খুশী করা যায় বলে কী আর সত্যি করা যায়!

তাকে শুধু এইটুকু বলে আসা যায়—আমার মুখ চেয়ে না হোক, সেই মরা মানুষটার দোহাই, টাকাটা ফেরত দিবি না।'

ও স্টেশন পর্যন্ত এসেছিল, একটু হেসে বলেছিল, 'নাঃ দেব না। আমি তো নির্লজ্জ।'

হয়তো ওর সঙ্গেও আর জীবনে দেখা হবে না।

ওর সঙ্গে সেনসাহেবের ব্যবধান প্রায় ইহলোক পরলোকের মতই। ওর জন্যেও যেন মৃত্যুশোকের স্বাদ অনুভব করছেন সুরথ সেন।

কিন্তু কার জন্যে বেশী মন কেমন করছে? যে সত্যি মরে গেছে, না যে বেঁচেও মরে থাকল?

বুলা আর বুলার আকাশ

সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে রেশনের ব্যাগগুলোর সঙ্গে বাজারের থলিটাও চাপিয়ে অনাদি তরতর করে আসছিল, ঠেক খেল গলির মুখে, অজিত সরকার একটু গলা চড়িয়ে বলে উঠল, চাকরিটা তাহলে তোর পারমানেণ্টই হয়ে গেল অনাদি? তা কত করে মাইনে ঠিক হয়েছে?

অজিত নিজেদের রোয়াকে বসে আছে, যেমন থাকে বেশী সময়। আর এই সরকার বাড়িটার সামনে দিয়ে ছাড়া বুলাদের বাড়িতে যাবার উপায় নেই।

অনাদি কথার উত্তর দিল না, শুধু একটু ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে বেড়িয়ে গেল সামনে দিয়ে; পিছনে একটা হ্যা হ্যা হাসির আওয়াজ যেন তার এই পালিয়ে যাওয়াকে একটা নির্লজ্জ ধাক্কা মারল।

হারামজাদার কাজকর্মও নেই! অস্ফুট বাল্যবন্ধু সম্পর্কে এই উক্তিটি করে অনাদি গলির দ্বিতীয় মোড়টা পার হয়ে বুলাদের বাড়ির দরজায় গিয়ে দাঁড়াল।

দরজা যথারীতি ভিতর থেকে বন্ধ, কড়ানাড়া দেওয়া ছাড়া গতি নেই।

এতগুলো মালপত্র সমেত সাইকেলটা দেওয়ালে ঠেকানোও শক্ত, অনাদি গলা তুলে ডাকল, বুলা বুলা!

আগে এ বাড়িতে সারাদিনে কখনো দরজা বন্ধ হতো না। সর্বদা সদর খুলে সামনের ঘরে বসে থাকতেন বুলার ঠাকুর্দা হরমোহনবাবু।

বুলার বাবাকে অনাদি ভাল করে দেখেনি, বুলারা ডিগবয় না ডিব্রুগড় কোথায় যেন থাকত, কখনো-সখনো বুলার বাবার ছুটি হলে আসত। তাও সব ছুটিতে নয়। এক একবার এক এক জায়গায় বেড়াতে যেত বুলারা। এখানে কদাচিৎ। শাদা ভয়েলের ফ্রক পরা শাদা মোজা জুতো পরা মাথায় রিবণ লাগানো ফুটফুটে মেয়েটাকে এই গলিতে বেজায় বেমানান লাগত।

অজিত, অনাদি, কমল এরা গলিতে গাবব্‌ু কেটে মার্বেল খেলত। বুলা যখন হরমোহনের সঙ্গে পার্কে বেড়াতে যেত, প্রায় সসম্ভ্রমেই পথ ছেড়ে দিত।

ক'দিনই বা? এখানে ছুচার দিন থেমে বুলারা বালিগঞ্জে মামার বাড়িতে চলে যেত। হরমোহন পুনর্মূষিকের মত আবার সদর ঘরের মধ্যে চৌকিটিতে বসে বসে তামাক টানতেন। কিন্তু বুলার যখন বছর নয় দশ বয়েস তখন হঠাৎ একদিন হরমোহনকে দরজায় তালা দিয়ে চলে যেতে দেখা গেল।

হরমোহন একাই থাকতেন, নিজে রেঁধে খেতেন, একটা ঝি বাসন মেজে বাটনা বেটে দিয়ে যেত। তার মুখেই পাড়ার লোকে শুনেছে, বাবুর এই একা থাকার জন্যে দাদাবাবু-বৌদি রাগারাগি করে। যখনি আসে সঙ্গে নে যেতে চায়, তা বাবু ভিটে ছেড়ে নড়বে নি। বৌদি এসে থাকবে কি, এই তো সংসারের ছিরি! তা আমিও বলি, ছেলে বৌ আদর করে ডাকছে যাও না বাবা, সেখানে রাজ-আদরে থাকবে। এখানে এই হাত পুড়িয়ে খেয়ে মরার গেরো কেন? কান করে না সে-কথায়। বলে, ভবির মা, তোকে এই সাফ্ কথা বলি— স্বাধীনতার ছাড়া সুখ নেই। সেখানে রাজ-আদর বটে, কিন্তু খাঁচার পাখির আদর। স্বাচ্ছন্দ্য নেই। সবসময় টিপটপ! ও কি আর আমার পোষায়? কপালে সুখভোগ না থাকলে যা হয়!'

হরমোহনের কপালে সুখভোগ নেই, হরমোহনের ছেলে সুরমোহনের ছিল। কিন্তু বেশীদিন সে সুখ সইল না তার। বুলার মা'র কপাল ভেঙে দিয়ে সে হঠাৎ একদিন বিনা নোটিশে বিদায় নিল।

হরমোহন পাড়ার কাউকে কিছু বললেন না, দরজায় চাবি লাগিয়ে হঠাৎ একদিন চলে গেলেন, তার ক'দিন পরে ফিরলেন বুলাকে আর বুলার মাকে নিয়ে। বুলার মাকে রংচঙে সিল্কের শাড়ি ছাড়া কেউ কখনো দেখেনি। এমন অন্যরকম দেখাচ্ছিল যে প্রথমে কেউ বুঝতে পারেনি, কে মানুষটা।

ওদের সঙ্গে জিনিস এল প্রচুর। অনেক ফেলে, অনেক বিলিয়ে আর অনেক বেচে দিয়েও যা নিয়ে এলেন হরমোহন ছেলের ভাঙা সংসার থেকে, তার অর্ধেকও তাঁর এই ভাঙা বাড়িতে ধরবার কথা নয়। তবু তাই রাখতে হল ঠেসে ঠুসে। বুলার মা'র বালিগঞ্জের বাপের বাড়িটা এতই ছবির মত যে তাতে অবান্তর একটা আলপিন রাখবারও জায়গা মিলল না। ওঁরা বললেন, শুধু বুলাকে নিয়ে চলে আসে তো আসুক বুলার মা।

বুলার মা বোধকরি ভাগ্য হারিয়ে কুটিল হয়ে গিয়েছিল। তাই দাদা বৌদির এই সস্নেহ আহ্বানকে উপেক্ষা করে ভাঙা বাড়ি রয়ে গেল। হরমোহনকে বলল, 'জিনিসের মত মানুষ দুটোও একদিন অবান্তর হয়ে যায় বাবা?'

রণ
দির
দির

'কিন্তু তোমরা কি এত কষ্টের মধ্যে থাকতে পারবে মা?'

বুলার মা চোখ তুলে শুধু একটু বিষণ্ণ হাসি হাসল। ওই হাসিটার মধ্যে হয়তো অনেক উত্তর ছিল। বুলাকে পাড়ার ইস্কুলে ভর্তি করে দিলেন হরমোহন।

বুলার মাকে এ গলিতে দৈবাৎ দেখা যায়, বেরোয় না সে। কিন্তু বুলাকে দেখা না গিয়ে উপায় নেই। বুলাকে স্কুলে যেতে আসতে হয়। অতএব পাড়ার ছেলেমেয়েরা ক্রমশ বুলাকে এ-গলিরই এ[illegible] ভাবতে শিখতে লাগল।

কিন্তু হরমোহন যতদিন ছিলেন তাঁর বাড়িতে প্রবেশাধিকার ছিল না বড় কারুর। আসবে এস বাবা, সদরের এই চৌকিতে বোসো, গাল গল্প করে চলে যাও। মিটে গেল। ওই পাহারার মধ্যে থেকে বুলা আস্তে আস্তে কখন যে ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরল, স্কুল ছেড়ে কলেজ, সেটা কেউই বোধহয় খেয়াল করেনি, খেয়াল পড়ল, যেদিন হরমোহন তাঁর সেই চৌকিটা খালি করে দিয়ে চলে গেলেন।

তখন লোকের চোখে পড়ল, ওই বাড়িটায় এখন থাকার মধ্যে আছে একজন রোগজীর্ণ অকাল-প্রৌঢ়া মহিলা, আর একটি লাবণ্য-

বতী ঝকঝকে চকচকে তরুণী। বুলার চেহারার এমন ধরণ, বুলা একখানা জেলে গামছার মত ডুরে শাড়ি পরে বেড়ালেও মনে হয় বুলা সেজেগুজে বেড়াচ্ছে। বুলার চোখ দুটো বেশী ঝকঝকে না সারা মুখটাই ঝকঝকে ঠিক বোঝা যায় না, তবে বুলা যে ছেলেদের আলোচ্য বস্তু সে বিষয়ে সন্দেহ নাস্তি।

হরমোহনের মৃত্যুতে পাড়ার ছেলেরা হঠাৎই হুড়মুড়িয়ে নিষিদ্ধ এলাকা ডিঙিয়ে ছিল। কারণ—ডাক্তার ডাকতেও তারা, ওষুধ আনতেও তারা, মড়া বইতেও তারা, শ্রাদ্ধ শান্তির ব্যবস্থা করে দেওয়াতেও তারা। বুলার মা কেবলই কুণ্ঠিত হতে লাগল, কৃতজ্ঞতা জানাতে লাগল, আবার ওদেরই ভরসা করতে লাগল।

কিন্তু হঠাতের ঢেউ সরে গেলে দেখা গেল ওই একগোছা ছেলের মধ্যে কেমন করেই যেন অনাদি নামের ছেলেটা স্থায়ী আসন দখল করে ফেলেছে। পুরুষ হিসেবে যে কাজগুলো বৃদ্ধ হলেও হরমোহন করতেন, সেগুলো অনাদির ওপরে এসে পড়েছে। অথবা—অনাদি নিয়েছে।

হরমোহন বাজার যেতেন ভবির মা'র ভগিটাকে সঙ্গে নিয়ে, রেশন আনতেন মুটে দিয়ে, বেশী কিছু দরকার হলে রিকশা নিতেন। হরমোহন কোনোদিন কারুর সাহায্য নেননি। কেউ দিতে চাইলে প্রত্যাখান করেছেন।

হরমোহনের পুত্রবধূকে বাধ্য হয়ে নিতেই হয়েছে। আর সেই নেওয়ার সূত্রেই অনাদির গতিবিধি। অনাদির সাইকেলটাও একটা ভূমিকা নিয়েছে। সাইকেলটা মুটের কাজ করে, রিকশার কাজ করে, এবং সময় সংক্ষেপ করে।

সাইকেল ব্যতীত এত কাজ হতো না।

যদিও বুলার মা বলে বারবার, 'এতগুলো জিনিস বয়ে নিয়ে কেন তুমি আসো বাবা? একটা মুটের মাথায় চাপিয়ে দিলেও তো—'

অনাদি বলে, 'কেন, মুটে ব্যাটাগুলোকে খামোখা পয়সা দিতে যাব কেন ?'

অনাদির কথাবার্তা এই রকমই রাফ, ওর থেকে সভ্য ধরনের কথা বলতে জানেই না সে। পাম্প মিস্ত্রীর ছেলে কতই বা হবে ? নিজে দুটো পাশ করেছে এই যা। কিন্তু তাতে কি অভ্যাস বদলায় ? বাড়ির ধারা যেমন, তেমনই হয়।

প্রথম প্রথম বুলা আর বুলার মা'র এ ধরণের কথাবার্তা ভারী খারাপ লাগত, ভেবে পেত না মানুষ ইচ্ছে করে কেন রুচি খারাপ করে ? কথায় কথায় 'ব্যাটা হারামজাদা' এমন সব শব্দ উচ্চারণ করে বসে। ক্রমশ গা সওয়া হয়ে গেছে। এখন আর অনাদির কথাগুলো তেমন কানের ওপর খট্ করে গিয়ে পড়ে না। অনাদির ওই গ্রাম্যতার মধ্যেও যেন একটি পরিচ্ছন্ন ভদ্রতা আছে।

অনাদির 'বুলা বুলা' ধ্বনি বাড়ির মধ্যে পৌঁছতে দেরী হবার কথা নয়, তবু সাড়া পাওয়া গেল না, অগত্যাই অনাদিকে অনেক কসরৎ করে দরজায় ধাক্কা মারতে হল। এবং সে ধাক্কাটা নেহাৎ মৃদু হল না।

এবার দরজা খুলল, সঙ্গে সঙ্গে একটা ঝঙ্কারও উঠল, বাবাঃ ! শ্রীযুক্ত অনাদি বাবু ? আমি ভাবলাম বুঝি ডাকাত পড়ল।

ওঃ ! ভাবলি ডাকাত পড়ল ! তা ভেবেও দরজা খুললি তাহলে ?

বুলা অম্লান মুখে বলে, তা ছাড়া উপায় কী ? না বললে তো দরজাটা ভাঙত ? তার মানে ডাকাত যা করবার করবেই, মাঝখান থেকে দরজাটা যাবে।

খুব বিচক্ষণ হয়েছিস বটে। বলে অনাদি সাইকেল থেকে ব্যাগ থলিগুলো নামিয়ে দালানে রাখে। বুলা হাত বাড়ালেও ওর হাতে দেয় না।

বুলা গম্ভীর ভাবে বলে, 'ওইটুকু বইতে আমি মরে যেতাম ?'

তুই মরতিস কি কে মরতো তার হিসেব দিতে বসছি না। এখন জিনিসগুলো ঘরে তোল।'

বুলা সেইগুলোর দিকে একবার কটাক্ষপাত করে বলে,' হবে অখন।'

অনাদির হঠাৎ ভারী রাগ হয়ে যায়। অজিতের সেই হ্যা হ্যা হাসিটাই হয়তো এখনো তাড়া করছিল তাকে, তাই অনাদি দপ করে জ্বলে উঠে বলে, 'কেন, হবে অখন কেন ? ওই ক'টা জিনিস ঘরে তুলতে এত সময় যাবে ?'

বুলা একটু অবাক হয়ে যায় বৈকি। অনাদির এমন মেজাজ তো দেখা যায় না। অবাকের পরই অবশ্য রাগ আসে। বুলাও সমান ওজনে বলে, 'তা তোমার কর্তব্য তো মিটে গেছে, এখন আমি তুলি চাই ফেলে দিই, তাতে তোমার দায়িত্ব কিসের ?'

আজ অনাদির মেজাজ একেই ভাল নেই, তার উপর আবার এই অন্যায় চোটপাট। অনাদি কড়া গলায় বলে, 'কর্তব্য মানে ? আমার আবার কর্তব্য কিসের ? পাড়ার দশটা ছেলের মধ্যে আমি একটা এই তো !—হঠাৎ আমি কী চোর দায়ে ধরা পড়লাম শুনি ?'

বুলা একতিলও না নড়ে অন্য দিকে তাকিয়ে বলে, 'সেটা তো আমিই তোমার কাছে শুনতে চাই। তোমার কেন এত চোরের দায়। তুমি কিসের জন্যে মাইনে করা চাকরের মত বাজার বইছ, রেশন বইছ, খিদমদগারি খাটছ ?'

অনাদি বুলার মুখে এমন কড়া এবং চড়া গলার কথা বড় একটা শোনেনি, তাই একটু থতমত খেয়ে বলে, 'খাটছি মানুষের চামড়া গায়ে আছে বলে।'

'ও তাই। তাহলে ধরে নিতে হবে, এ পাড়ায় একমাত্র তোমার গায়েই মানুষের চামড়া, আর সব্বাইয়ের গণ্ডারের !'

সদরঘরে আজকাল আর কেউ বসে না। বসবার লোক নেই

বলেই বসে না,' ঘরটা নেহাৎই চলন হিসেবে পড়ে আছে, হরমোহনের সেই সরু চৌকিটা তুলে এনে দালানে পাতা হয়েছে। এখানেই বুলার মা'র দিনের শয্যা।

সদারুগ্ন বুলার মা প্রায় শুয়ে শুয়েই কাটান। আজই শুধু তাঁকে এখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

বুলা এই চৌকিটার ওপরই বসে ছিল, অনাদিকে একবারও বলেনি, 'তেতে পুড়ে এলে অনাদিদা, বোসো একটু।' তবু অনাদি বসে পড়ল তার একাংশে। বলল, 'বলনি তো বলি, গণ্ডারেরও নয় ছুঁচোর।'

'তাই বুঝি? খুব কটকট করে শোনায় বুঝি তোমায়?'

অনাদি থমকে বলে, 'আমায়? আমায় কী শোনাবে?'

'কেন? শোনাবার মত কথার অভাব আছে না কি? অনায়াসেই বলতে পারে, কী রে অনাদি, ও-বাড়ির বাজার সরকারের চাকরিটা বাগালি তাহলে? বলতে পারে—'

অনাদির মাথাটা ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে।—ওঃ, পাজী উল্লুক অজিতটা তাহলে এখানে এসেও বলে গেছে ওইসব অসভ্য কথাগুলো।

অনাদি উঠে দাঁড়ায়, বলে ওঠে, 'বটে! আচ্ছা! যাচ্ছি রাস্কেল-টাকে শায়েস্তা করে দিতে। জন্মের শোধ হাসি ছুটিয়ে দেব যাদুর।'

'ও মা, ও কি! রাস্কেল আবার তুমি কাকে পেলে? বুলা আকাশ থেকে পড়ে, শায়েস্তাই বা করবে কাকে?'

'যে শালা বলেছে এই সব ছোটলোকের মত কথা।'

বুলা গম্ভীর গলায় বলে, 'অনাদিদা, আবার?'

অনাদি ওই নিষিদ্ধ শব্দটা উচ্চারণ করেই মনে মনে জিভ কেটে-ছিল, কারণ বুলার কড়া নিষেধ—'কথায় কথায় ওরকম মুখ আলগা করলে আমার সঙ্গে কথা বন্ধ, এই বলে রাখলাম।' আগে তো ওটাই কথার মাত্রা ছিল অনাদির, যেমন এখনো আছে পাড়ার অন্য ছেলেদের।

অনাদি বলে, 'আচ্ছা আচ্ছা, খুব মাস্টারী হয়েছে, কিন্তু আমি ওকে ছেড়ে কথা কইব না তা বলে দিচ্ছি।'

বুলা অবাক গলায় বলে, 'কাকে ছাড়বে না, সেটাই তো বুঝতে পারছি না।'

'ওঃ, আকাশ থেকে পড়লি যে? নিজেই তো বলে ফেললি। লোকে ওই সব বলে। কে বলে জানি না আমি? এখন বুঝি খুনোখুনি হবার ভয়ে তার নামটা চেপে যাচ্ছিস?'

'আমি কারুর নাম-টাম চাপিনি—' বুলা শক্ত গলায় বলে, 'বাড়ি বয়ে কেউ কিছু বলতেও আসেনি, ঘটে একটু বুদ্ধি থাকলেই সহজ কথা সহজ ভাবেই বোঝা যায়।'

'তার মানে তুই বলতে চাস অজিতটা এসে কিছু বলে যায়নি?'

'অজিত? তুমি যে হাসালে অনাদিদা। ওই অজিতটা কোনোদিন মুখ তুলে কথা বলে আমার সঙ্গে?'

'তাহলে তুই ওর ওই ছোটলোকমী কথাগুলো জানলি কী করে?'

'বললাম তো, ঘটে একটু বুদ্ধি থাকলেই জানা যায়। পাড়ায় এত ছেলে, অথচ তোমারই এই দুটো হতভাগা মানুষের জন্যে এত মাথাব্যথা। এ ঘটনা লোকের চোখে পড়ে না বলছ?'

'চোখে পড়ে? চোখে পড়ে মানে? চোখে পড়বার মত আমি কী করেছি শুনি? বাড়িতে বেটাছেলে বলতে কেউ নেই। তাই এইগুলো একটু করে দেওয়া। এই তো ব্যাপার। লোকে কি বলতে চায় তুই বাজার যাবি? না মাসিমা রেশনের দোকানে যাবেন?'

বুলা অম্লান মুখে বলে, 'না যাওয়ারও কিছু নেই। এ পাড়ায় তো ওসব কাজ মহিলারাই করেন। বাড়ি বাড়ি খোঁজ নিয়ে দেখ গে। এই তো এই কিছুক্ষণ আগে বাসন্তীর জ্যাঠাইমা রিকশা করে রেশন ডাব মাটির কুঁজো এই সব নিয়ে গলিতে ঢুকলেন।'

'বাসন্তীর জ্যাঠাইমা!' অনাদি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলে, 'বুলা, ওদের সঙ্গে তুলনা করবার আগে স্মরণ করিস তুই কার মেয়ে। মাসিমা কী ছিলেন!'

বুলা কিন্তু এ গাম্ভীর্যকে তিলমাত্র মূল্য দেয় না, বলে ওঠে, 'ছিলেন! এখন তো আর নেই? সেই অতীত ইতিহাস স্মরণ করার কোনো মানে আছে?'

'তোর কাছে নেই, আমার কাছে আছে। যাক্‌গে, তোর সঙ্গে বকবক করতে পারি না। মাসিমা আজ ঘরে কেন? শরীর বেশী খারাপ নাকি?'

বুলা হাতপাখা খানা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলে, 'মা তো ঘরে নেই।'

'তাহলে? ছাদে উঠে বড়ি-টড়ি দিচ্ছেন না তো?'

'উঁহু!'

'হেঁয়ালি রাখ তো। কোথায় মাসিমা?'

'বাড়িই নেই।'

বাড়িই নেই?

হঠাৎ বুকটা ধড়াস করে ওঠে অনাদির। বুলার মা বাড়ি নেই বুলা একা। তার এই এতক্ষণ সে বসে রয়েছে! পাড়ার পাজীরা জানতে পারলে না জানি কী বলবে কে জানে।

কিন্তু বুলার মা বাড়ি নেই এ কথার অর্থ? তিনি তো পাড়া বেড়াবার মেয়ে নয়? কারুর বাড়িতেও তো যান না। সেই অপরাধে পাড়ার মহিলারাও তেমন আসেন না। নচেৎ হরমোহন মারা যাওয়ার পর পাড়াসুদ্ধ সকলেই তো বুলা আর বুলার মাকে সান্ত্বনা দিতে এসেছিলেন, এবং পাহারাদার বুড়ো সরে যাওয়ায় বুলার মা যে এবার একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে, চন্দ্র সূর্যর মুখ দেখতে পাবে, এ আশা খোলাখুলি ব্যক্ত করেছিলেন।

বুলার মা ওনাদের ধারণার ধার দিয়েও হাঁটল না। বুলার মা অসূর্যম্পশ্যাই থেকে গেল। আর কে কত আসবে? লোকের মান

মর্যাদা নেই? তাছাড়া গেলেও তো উষ্ণ অভ্যর্থনা নেই। শীতল সৌজন্যের ধার কে ধারে?

অতএব বুলার মা'র এই দালান আর ওই ঘরই পৃথিবী।

বুলার মামারা আগে গাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে দেখেছে, বুলার মা শুধু বুলাকে পাঠিয়ে দিয়েছে, নিজের শরীরের দোহাই পেড়ে। হরমোহন মারা যেতে বুলার বড়মামা তো একবার এ প্রস্তাবও করেছিল, 'ওখানে ওভাবে একা পড়ে থাকার তো কোনো মানে হয় না। ও বাড়িটা ভাড়া দিয়ে আমার এখানে একটা ঘর নিয়ে না হয় সেপারেটই থাক। যৎসামান্য যা ভাড়া উঠবে কাজে লাগবে। শ্বশুরের পেন্সনটাও তো গেল।'

বুলার মা বলেছিল, 'দেখি, যদি চালাতে না পারি তোমরা তো আছই।'

দাদা বলেছিল, 'এত বড় একটা মেয়ে নিয়ে একা থাকা তো সেফ নয়। এটা একটা ছোটলোকের পাড়া।'

বুলার মা হেসে উঠে বলেছিল, 'আমরাও তো ক্রমশ ছোটলোক বনে যাচ্ছি দাদা! বরং বালিগঞ্জেই বেমানান লাগবে আমাদের।'

দাদা মনে মনে না বলে পারেনি, যা বললে, তা খুব ভুলও নয়। কিন্তু মুখে বলেছিল, 'ওটা তো কোনো কথা নয়, এটা তোর অন্যায় জেদ।'

'তবে আর কী, জানোই তো।' বলে হেসেছিল বুলার মা।

অতএব ভাইদের বাড়ি যাবারও পাট নেই। তবে?

অনাদি অবাক হয়ে বলে, 'মাসিমা একা কোথায় গেলেন? পাড়ায়?'

'ক্ষেপেছ? পাড়ায় মা জন্মেও যায় না।'

'তা তো জানি। তাই তো আশ্চর্য হচ্ছি। মামাদের অসুখ-টসুখ নয় তো?'

'বালাই ষাট।'

অনাদি এবার রেগে উঠে বলে, 'তাহলে কী এমন রাজকার্য পড়ল তাঁর, যে তোকে এই নিশ্চিন্দিপুরীতে একা রেখে বেড়াতে গেলেন?'

বুলা দিব্য সপ্রতিভ ভাবে বলে, 'জানেনই তো বেশীক্ষণ একা থাকতে হবে না, আজ রেশনের দিন, তুমি আসবেই নির্ঘাৎ।'

'ও! আসবই নির্ঘাৎ।' অনাদি কী বলবে ভেবে না পেয়েই বোধ করি বলে বসে, 'আর তাই যদি আসিই, সেটা কি খুব ভাল হল? এই একা বাড়িতে—'

'ও মা। শোন কথা।' বুলা হেসে ওঠে, 'একা পেয়ে তুমি আমায় খেয়ে ফেলবে না কি? বরং ভালই তো হল, মুখ বুজে বসেছিলাম কথা কয়ে বাচছি।'

অনাদি সহসা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'আমি কি আর তোদের সঙ্গে কথা বলার যুগ্যি রে বুলা? নেহাৎ দয়া করে দাদা বলে ভাবিস, তাই। নইলে আমি কি আর জানি না তোরা কোন্‌খানের, আমি কোন্‌খানের।'

'তোমার জানাটা আবার কেমন অনাদিদা? আমি তো জানি তুমিও এই সুদাম ঘোষ লেনের, আমরাও এই সুদাম ঘোষ লেনের।'

'আমার সেটা বিশ্বাস হয় না বুলা—' অনাদি স্বভাবছাড়া গভীর গলায় বলে, 'আমার মনে হয় তোরা যেন শাপভ্রষ্ট হয়ে এখানে বাস করছিস।'

'ও বাবা, তোমার তো বেশ কল্পনা শক্তি!' বুলা হেসে বলে, 'তবে বোসো একটু, চা করে আনি। মাথা আরো খুলবে।'

'চা!' অনাদি আর একবার অবহিত হয়, একা বাড়িতে বুলা তাকে চা খাওয়াচ্ছে! অনাদি চঞ্চলভাবে বলে, 'না না, এখন আর চা করতে হবে না, আমি যাই।'

বুলা হেসে উঠে বলে, 'তুমি যেন ভূত দেখলে মনে হচ্ছে অনাদিদা, এত ভয় কিসের?'

'ভয় আবার কি? ভয় আবার কি?' অনাদি তাড়াতাড়ি জুতোয় পা ঢোকায়, 'আমার কাজ আছে। কিন্তু মাসিমা একা কোথায় গেলেন তাই ভাবছি।'

'একান্তই শুনতে চাও?'

বুলা একটু হেসে বলে, 'মা'র মাথায় একটা গন্ধমাদন পর্বত চাপানো আছে না কি। সেটাকে মাথা থেকে নামাবার চেষ্টা করতে হবে কি না?'

অনাদি একটু থমকে বলে, 'তার মানে?'

'তার মানেটা বাড়ি গিয়ে ভেবো। এখন লাইব্রেরীর বইটা নিয়ে যাবে?'

অনাদি একটু দাঁড়িয়ে পড়ে বলে, 'লাইব্রেরীর বই? আজই পড়া হয়ে গেছে?'

'বাঃ ওইটুকু তো বই। আচ্ছা আজ না হয় থাক্।'

'থাকবে কেন, দে।'

বুলা বইটা এনে দিয়ে বলে, 'চা-টা ফেলে নিয়ে চলে যাচ্ছ, তুমি খেলে আমারও একটু খাওয়া হতো।'

'এই ছাখ।' অনাদি বলে, 'তা সে কথা আগে বলবি তো? দে তবে।'

'নাঃ আর হয় না। তুমি একেবারে ঘোড়ায় জিন দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লে।'

অনাদি একটু ক্ষুণ্ণভাবে বলে, 'তুই এমন উল্টোপাল্টা কথা বলিস।' তারপর আস্তে আস্তে নেমে যায় অনাদি। 'বলে যায় দরজাটা ভাল করে দিয়ে দে।'

বাইরে দাঁড়িয়ে সাইকেলের হ্যাণ্ডেল ধরে অনাদি বুলার আগের কথাটা ভাবে, কী বলল তখন বুলা?

ফেরার পথেও অজিত। অনাদিকে দেখে আবার হাঁ হাঁ করে

বলে ওঠে, 'কী বাবা, নির্জনপুরীতে একটু আলাপ-সালাপ জমাতে পারলে ?'

অনাদি সাইকেল থেকে নেমে পড়ল। ক্রুদ্ধ গর্জনে বলে উঠল, 'দাঁতগুলো আস্ত রাখতে চাস কি চাস না ?'

'আরে বাবা, রেগে যে আগুন হচ্ছিস। দেখলাম তো জননী মটর গাড়ি চড়ে চলে গেলেন কার সঙ্গে যেন। বোধ হয় ভগিনী টগিনী হবেন। এক ছাঁচের মুখ। কন্যে রইলেন বাড়িতে—এমন সুযোগ ক'বার আসে বল বাবা।'

'অজিত, এক সময় তুই আমার বন্ধু ছিলি, কিন্তু একথা ভাবতে আমার লজ্জা করে!' বলে চলে যায় অনাদি।

অনাদির বাড়ি এ গলির মধ্যে নয়, পাশের গলিতে। ছেলেবেলা থেকে খেলা করার সুত্রে এ গলিতে আসা যাওয়া অনাদির।

বুলার মা'র পিসতুতো দিদি বুলার জন্যে একটি পাত্র ঠিক করে বুলার মাকে নিয়ে গিয়েছিল সেখানে। বুলার মা ফিরল সন্ধ্যে পার করে।

পাত্রের মত পাত্র একটি ঠিক করেছে রানুদি। ভাব নিজেরই ভাগ্যে। বাড়ি ঘর দেখে বুলার মা যেন অভাবে হিংসে গিয়েছিল। বুলার মা'র অবাক লাগছিল, এই সব পরিচিত জগৎ থেকে নির্বাসন দণ্ড নিয়ে বুলার মা বুলাকে কোথায় রেখে মানুষ করছে ?

কেন করেছে এমন ?

বুলার মা'র আজ অনুতাপ হচ্ছিল। তবে বুলার ভাবী জীবন সম্পর্কে আশ্বাস পেয়ে এসেছে বুলার মা।

রানুদি উদাত্ত গলায় বলেছে, 'ওরা শুধু মেয়েটিকে চায়। সুন্দর একটি মেয়ে। সুন্দরী মেয়ে তো দুর্লভ, পাবে কোথায় ? আমার হঠাৎ তোর মেয়ের কথা মনে পড়ে গেল। ব্যাস, সঙ্গে সঙ্গে চলে গিয়েছি তোর কাছে। তা দেখলি তো বাড়িঘর, ও মেয়ে একেবারে স্বর্ণ সিংহাসনে গিয়ে বসবে। ওই তো একমাত্র ছেলে। আর আমার

ননদও নিপাট ভালমানুষ। মেয়ে যাকে বলে সুখের গদিতে শোবে।'

সেই আশ্বাস নিয়ে বাড়ি ফিরেছে বুলার মা। মুখে প্রসন্নতা, চোখে দীপ্তি।

মাকে কতকাল এমন দেখেনি বুলা। মনের গভীর স্তর থেকে একটা ছবি ভেসে ওঠে বুলার চোখের সামনে।

বুলাদের সেই পাহাড়ের কোলের বাড়ির সামনের বাগান, সেখানে সুন্দর রঙিন বেতের চেয়ার পাতা, চেয়ারের পিঠের কাছে [illegible] রঙিন বাঁশের খুঁটিতে বিচিত্র কাজ করা তালপাতার ছাতা।

বুলার মা আর বাবা চেয়ার দুটোতে বসে আছেন একটু দূরে দূরে, আর ছোট্ট একটা মেয়ে ছুটোছুটি করে প্রজাপতি ধরছে। মেয়েটাও বুঝি প্রজাপতির ডানার মত সুন্দর সাজে ঝলমলে।

বুলার মা'র মুখে তখন সর্বদাই বিরাজ করত এই দীপ্তি! এই প্রসন্নতা। বুলার মা'র হাতে প্রায়ই একটা আধবোনা সোয়েটার কি [illegible] বোনা লেস থাকত, থাকত বোনার কাঠি কি কুরুশকাঠি। [illegible] না যে খুব হতো তা নয়। শুধু কাছে রাখাটা বুলার মা'র শখ।

বুলা মাকে সেখানে সেই পরিবেশে সিল্কের শাড়ি ছাড়া আর কিছু পরতেই দেখত না। বুলা ছুটে এসে মাকে জড়িয়ে ধরে বলত, 'মা, মা গো, তুমি কি সুন্দর। পৃথিবীতে তোমার মত সুন্দর নেই।'

বুলার বাবা বুলার ঝুরো চুলগুলো নেড়ে দিয়ে হেসে হেসে বলত, 'এখন নেই, কিছুদিন পরে থাকবে।'

বুলার মা বলত, 'ইস! তোমার মেয়ে তো তোমার মত গোল্লামুখী।'

বুলার বাবা বলত, 'তোমার মেয়ে তোমার মত, ছিপছিপে মুখী হবে। বড় হতে দাও।

বুলা ছুটে ছুটে বাবার কাছে মা'র কাছে এসে দাঁড়াত, আবার

ছুট মারত। কিন্তু সে বুলা কি এই বুলা? আর বুলার সেই মা কি এই শীর্ণ ক্লান্ত অকাল-প্রৌঢ়া রমণী?

বুলার সেই জীবনটা যেন স্বপ্নের ছবির মত মনের ভিতর ঘরের দেওয়ালে টাঙানো আছে। বুলার হঠাৎ বুকের মধ্যেটা কেমন করে এল। বুলার মনে হল হঠাৎ সেই ছোট্ট বুলাকে কুড়িয়ে পেয়ে গেল বুলা।

কোথায় কুড়িয়ে পেল?

সেই দেশটা কোথায়?

সেই বাড়িটা?

সেই বাগানটা?

সে কি স্বপ্নের? নাকি সত্যি?

বুলা যদি হঠাৎ একদিন প্লেনে চড়ে সেখানে গিয়ে পড়ে? যেমন সেই আসত যেত?

নেমে পড়লেই দেখতে পাবে যেখানে যেমনটি ছিল তেমনি আছে

বুলার মা বাইরের শাড়িটা ছেড়ে স্নানের ঘরে ঢুকে পড়ে

বড় গরম বলে, বুলা শুধু কলের জল পড়ার শব্দটা পাচ্ছিল। ছড়ে

বুলা হঠাৎ ওই শব্দের মধ্যে হারিয়ে গেল। বুলার মনে হতে লাগল দূরে পাহাড়ে ঝর্ণার জল পড়ার শব্দটা আসছে।

বুলা সেই দিনটার ছবির মধ্যে হারিয়ে গেল, যখন প্রতিবার বাবার ছুটি শেষে কলকাতা থেকে ফিরে সেখানে গিয়ে পড়ত। আকাশে উড়ে উড়েই গেল। বাবা-মা-বুলা।

এরোড্রোম থেকে বেরিয়ে এসেই দেখল তাদের সেই শাদারঙের মস্ত বড় গাড়িটা এসে দাঁড়িয়ে আছে। বুলাদের দেখেই দীপ বাহাদুর লম্বা সেলাম করে গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে দাঁড়াল।

বাবা বললেন, 'কী দীপবাহাদুর, সব আচ্ছা হ্যায়'?

দীপ বাহাদুর বলল, 'জী হুজুর।'

বুলা বলল, 'আমার জন্যে পাথর জমিয়েছ দীপবাহাদুর?'

দীপ বাহাদুর বুলাকেও বলল 'জী।'

বুলার মা বললে, 'পাথর? 'পাথর কী রে বুলা?'

বুলা চুল দুলিয়ে, মাথার ফিতে ঝুলিয়ে বলে উঠল, 'ও তুমি বুঝবেনা। দীপবাহাদুর আমার জন্যে ঝর্ণা তলা থেকে পাথর এনে রেখে দেবে বলে রেখেছিল।'

বাবা বললেন, 'বাঃ চমৎকার! তুমি তো বেশ কাজ দিয়ে গেছ ওকে? ঝর্ণাতলা কি এখানে? ও সেইখান থকে পাথর আনবে?'

বুলা হেসে হেসে বলল, 'আনবে কেন? এনে রেখেছে। না দীপবাহাদুর?'

গাড়ি তখন চলছে ছবির মত পটভূমিকায় ছবিতে আঁকা রাস্তার মতো রাস্তা দিয়ে।

দীপবাহাদুর নির্ভুল নিয়মে সাঁ সাঁ করে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যেতে যেতে বুলার কথার উত্তরে শুধু বলে 'জী।'

'তোমার কেবল 'জী জী।' কতগুলো পাথর এনেছো শুনি?'

দীপবাহাদুর বুলার তাড়নাতেই বাংলা কথা বলতে না পারলেও ...ত শিখেছিল। বুলা তাকে—বলত, বোসো আমি তোমায় কথা শেখাই। বলত—'বাবা'

দীপবাহাদুর খুব গম্ভীর ভাব দেখিয়ে বলত,

'বাবা।'

বল 'মা'।

'মা!'

বল 'আমি ভাত খাব।'

দীপবাহাদুর বিপদে পড়ার ভঙ্গীতে থেমে থেমে বলত, 'আমি —ভাত খাব।'

সেদিন—

যখন বুলা বলল, 'কতগুলো পাথর এনেছ?'

দীপবাহাদুর অবলীলায় স্টিয়ারিং থেকে দুটো হাতই তুলে যতটা

সম্ভব ছড়িয়ে নিঃশব্দে দেখাল, 'এতো।'

তারপব গাড়ি থেকে নেমেই 'পাথর পাথর'।

গ্যারেজের এক পাশে জমা করা ছিল, এক্ষুণি তাদের টেনে বার করা হল, জল ঢেলে ঢেলে ধোওয়া হল। একাজ গুলো অবশ্য দীপবাহাদুর করল না, কবল কাশীবাজ। কাশীরাজই বুলার সঙ্গী বন্ধু খিদমদগার।

বুলা বলত, 'তুই রাজা না হাতী।'

কাশীবাজ কিছু না রেগে দৃঢ় গলায় বলত, 'আমি রাজা।'

'বাজা তো তোর মাথায় মুকুট কই? জরিব পোষাক কই?'

কাশীবাজ তেমনি দৃঢ়তাব সঙ্গে বলত, 'বাড়িতে আছে।'

'তোব বাড়িতে আমায় নিয়ে চল তবে।'

'সে অনেক দূর।'

'আমি গাড়ি চড়ে যাব।'

'গাড়ি যাবেনা, পাহাড় আছে। দেহাতী রাস্তা, গাড়ি পাংচার হয়ে যাবে।'

বুলা বলত, 'তোব সব বাজে কথা তবে তুই তোর রাজ্য ছেড়ে চলে এসেছিস কেন?'

'ওখানে মন লাগে না।'

'কী বোকাবে! নিজের বাজত্ব ভাল লাগে না? এখানে যে তোকে কত কাজ করতে হয়?'

'হল তো কী হল?'

'তোব কষ্ট হয়—'

'দুব! কাশীরাজ ওই কাজে ডব পায় না।'

'আমি বড় হলে তোর দেশে যাব।'

'আচ্ছা।'

'শুধু এই, শুধু আচ্ছা।'

কাশীরাজের শুধু এই 'আচ্ছা'

বুলা যখন বলল, আমার পাথরগুলো ধুয়ে দে—।

কাশীরাজ বলল 'আচ্ছা।'

তোয়ালে দিয়ে ভিজেটা মুছে দে।

'আচ্ছা।'

বুলার মা রেগে বলে উঠেন, 'তুইও তো আচ্ছা ছেলে কাশী। কেবল আচ্ছা আচ্ছা। খুকুকে চান করাতে হবে না? ভাত খেতে হবে না? বুলা শাগগিরি চলে এসো—'

বুলা কথায় কান দেয় না, বুলা পাথরের সংগ্রহগুলি ফ্রকের কোঁচড়ে ভবে শোবার ঘরের জানলায় নিয়ে গিয়ে জড়ো করে। যে জানলায় বুলার মার বেটে জ্যাকটাসের টব্ সাজানো।

বুলার মা বলেন, 'ব্যাস এবার হয়েছে তো? এবার এসো।'

কিন্তু তখন বুলাকে টেনে নিয়ে যাওয়া মার সাধ্য না কি?

বুলা ছুটে ছুটে বাবাকে দেখাতে যায়, 'বাপী বাপী দেখ কী নী—ল পাথরটা। এই পাথরটা ঠিক সাবানের মত না বাপী? আর এইটা পাঁচ্ কলের মতন।'

অনেকক্ষণ পরে মার রাগারাগিতে বাবাই ডেকে নিয়ে গেলেন বুলাকে। বললেন, 'চল চল বুলা, এবার তোর মা মণি রেগে আগুন হয়ে যাবে।'

বাবার সঙ্গে খেলা করায় বেশ মজা ছিল, বাবা চুপি চুপি ডাকতেন, 'আয় বুলা আমরা এই বেলা খেলে নিই, এক্ষুনি মা খেতে ডাকবে।'

খেলার মধ্যে সব থেকে প্রিয় খেলা ছিল বুলার ধরে নিতে হবে বাইরে ভীষণ বৃষ্টি পড়ছে, আর বুলা কোনো শেড্এর নীচে আশ্রয় নিয়েছে।

বুলার এই শেড্টা হতো বাবার লেখার টেবিল।

বুলা তার নীচে ঘাড় গুঁজে বসে থাকত আর মাঝে মাঝে টেবিলের তলা থেকে হাতবাড়িয়ে 'অনুভব' করত বৃষ্টি থেমেছে কিনা।

বৃষ্টি অনেকক্ষণই থামত না, শেষ পর্যন্ত বাবা বুলার কাছে বুলার ছোট্ট রঙিন সিল্কের ছাতাটা নিয়ে এসে বলতেন, 'খোকিবাবা, ছাতা—'

'খোকিবাবা' টেবিলের তলা থেকেই ছাতার নীচে মাথা দিয়ে গুড়ি গুড়ি বেরিয়ে এসে 'গাড়ি'তে চড়তেন। গাড়িটা হতো বাবার রকিং চেয়ারটা। বসে পড়ে চাপ দিয়ে দিয়ে ঘুরপাক খেত আর মুখে গাড়ি চলার আওয়াজ তুলতো 'সোঁ—ও—ও।'

কিন্তু ক'দিনইবা এ খেলার সময় বাবার?

শুধু ছুটির দিনে, তাও কত লোক আসত সে সব দিনে।

আর রোজ দিনতো সকালবেলাই দীপবাহাদুর গাড়ি নিয়ে হাজির থাকত, বাবা আর বুলা ব্রেকফাস্ট করে নিয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠে বসা।

মা দরজার কাছে এসে দাঁড়াতেন, কাশীরাজ বুলার বইয়ের ব্যাগ আর জলের ফ্লাস্ক টিফিন কৌটো সব বয়ে নিয়ে এসে গাড়িতে তুলে দিত।

তুপুর বেলা দীপচাঁদ খালি গাড়িটা নিয়ে খুকুর ইস্কুলের সামনে গিয়ে দাঁড়াত। বাবা তখন না। বাবার বাড়িতে ওই সকাল বেলায় ব্রেকফাস্ট।

রাতে মা বাবা একসঙ্গে খেত, বুলাকে তখন ঘুমোতে যেতে হতো। রাত অবধি জেগে ঘুরে বেড়ান মা ভালবাসতেন না।

সেদিন বাবার ছুটি ছিল, কিন্তু বুলার ওই খেলাটা হয়ে ওঠেনি।

বাবা বলেছিলেন, 'বুলা আজ নয় আজ অনেক কাজ—।

বুলা তখন পাথরগুলো নিয়ে কাশীরাজের সঙ্গে খেলা করতে চলে গিয়েছিল।

একসঙ্গে খেতে বসল।

ছুটির দিনে এই সুখটি হতো।

আর বাবার সামনে বুলার মা কিছুতেই বুলাকে—বেশী করে খাবার জন্যে বকতে পারতেন না।

বকলেই বাবা বলতেন, 'আহা খেতে পারছে না। বকছ কেন? তুমি তো দেখি ওর থেকেও কম খাও।'

মা বলতেন, 'বেশ ওর সামনে বল খুব করে। আরো কম খাবে। ছোট বাচ্চাদের যতোটা খাওয়া দরকার, বড়োদের ততোটা নয়। বুঝলে?'

সেদিন কিন্তু বুলাকে বকতে হয় নি, বুলার দারুণ খিদে পেয়েছিল, সব খেয়ে নিয়েছিল।

বাবা বললেন, 'মামার বাড়িতে থেকে এসে বুলা বেশ লক্ষ্মী হয়ে গেছে।'

তারপর কী যেন কথা হলো মনে নেই বুলার, শুধু মার আলো ঝলসানো মুখটাকে মনে পড়ছে।

মা হেসে হেসে বলছেন, 'যতোই বাপের বাড়ির আরাম হোক, নিজের বাড়িতে এলে মনে হয় বাঁচলাম।'

মার সেই হাসি হাসি মুখটা একেবারেই তো ভুলে গিয়েছিল বুলা।

হঠাৎ একদিন যে সেই আলোটা ফিউজ্‌ড্‌ হয়ে যাবার মতো কী হয়ে গেল!

সেদিনটা যেন কুয়াশা ঢাকা আচ্ছন্ন আচ্ছন্ন।

বুলাদের বাগান থেকে—দূর পাহাড়ের গাটা যেমন ধোঁয়া ধোঁয়া দেখাতো, সেই রকম।

বুলার বাবা সকালেও তো বুলাকে স্কুলে নামিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছিলেন, তারপর যে কখন কোথায় কী হলো!

বুলার বাবাকে আর বাড়িতেই আনল না দীপবাহাদুর, কোথায় না কি হাসপাতালে রেখে এসেছে।

—অবশেষে বাবাকে একটা কালো লম্বা গাড়ি করে নিয়ে চলে গেল, বুলা অবাক হয়ে দেখল।

ওই পাহাড়ের কোনে দীপবাহাদুর, কাশীরাজ, মদন সিংদের সঙ্গে

থেকে থেকে বুলা অবশ্যই বয়সের থেকে কিছু ছেলে মানুষ ছিল। তবু মৃত্যুকে বুঝতে দেরী হয় নি তার।

হয়তো নিতান্ত শিশুরও হয় না।

শিশু তার সহজাত বুদ্ধিতেই বুঝে ফেলে, এটা মৃত্যু, এটা শেষ। এই লোককে আর দেখতে পাওয়া যাবে না।

বুলাও বুঝতে পেরেছিল।

আর বুলা যেন এও টের পেয়েছিল মার সেই দপদপে মুখটার ওই আলোটা যে দপ্ করে নিভে গেল, ওটাও আর ফিরবে না।

অথচ ভাব ক'ঘণ্টা আগেও বুলা, কাশীরাজের ওপর রেগে গিয়ে তাকে মেরে মেরে অস্থির করে দিয়েছিল।

দাদু যখন তাদের নিয়ে আসতে গেলেন, তখন বুলার জিনিসগুলো গোছাতে গোছাতে বুলার মা বলল, বুলা তোমার পাথরগুলো ?'

বুলা বলল, 'ও ঘরে।'

'নিয়ে এসো এতে ভরে নিই।'

বুলা জোরে মাথা নাড়ল।

মা বললেন, 'কেন ? নিয়ে নাও না।'

অথচ বুলার মনে হচ্ছিল, এই কথাগুলো যেন মা বলছে না। যেন কোথা থেকে কে বলছে। মাব মুখটাই বুলার পাথরদের মতো।

বুলার যে কী হলো, বুলা আরও জোরে মাথা নেড়ে বলল, 'না নেব না।'

যেন কারুর ওপর রাগ হয়েছে বুলার।

বুলারা চলে আসার সময় কতো কাণ্ডই যে হলো।

কতো-লোক এলো, বাড়ির জিনিস পত্তরগুলো কোথায় কোথায় চলে গেল, আবার কিছু কিছু প্যাক করাও হলো। বাবার অফিসের পিয়ন বেয়ারারা এই সব করে দিল।

আর যখন বুলারা গাড়িতে উঠে বসল ?

না, সেই শাদা গাড়িটায় নয়, যেন কোথায় কি হয়ে গিয়েছিল। মাথুর সাহেবের ছোট্ট কালো গাড়িটা এসে দাঁড়িয়ে ছিল সকাল থেকে। তাতেই চড়ে বসল বুলারা।

যা জিনিসপত্তর বুলারা নিয়ে এসেছিল তাও তো মা নিতে যাননি, প্যাক করার সময় কেবল বলেছেন, 'কিচ্ছু দরকার নেই, কিচ্ছু দরকার নেই। সব ফেলে দিয়ে যান।'

দাদু বলেছেন, 'তোমার আমার দরকার না থাক, বুলুর হতে পারে।'

গাড়িতে ওঠার সময় দীপবাহাদুর মদন সিং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল, আর কাশীরাজ? সে তো বাগানে লুটোপুটি খাচ্ছিল।

সেই সময় বুলা কিন্তু তার সঙ্গে ভয়ানক একটা দুর্ব্যবহার করেছিল। ভাবলে এখনো প্রাণের ভিতর কেমন করে ওঠে। বুকটা কে যেন খামচে ধরে।

গাড়ি ছাড়ো ছাড়ো সময় হঠাৎ কাশীরাজ ছুটে এসে একটা বেতের সাজি করে সেই নানা ছাঁচের নানা রঙের পাথরের নুড়িগুলো নিয়ে এসে গাড়ির মধ্যে তুলে দিল, ওর খুব মন কেমন করছিল বলেই না দিতে এসেছিল?

কিন্তু কী যে হলো বুলার, বুলা চেচিয়ে বলে উঠল, বললাম না নেব না।'

বলেই পাথরগুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে এদিক সেদিক ফেলে দিলো।

কাশীরাজ হঠাৎ স্থির হয়ে গেল।

কান্না থামিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে রইল, গাড়িটা ছেড়ে দিল।

বুলা এখনো সেই ঝোলা হাফপ্যান্ট আর বেঁটে বুশ শার্ট পরা ছেলেটাকে একটা চলে যাওয়া গাড়ির ধারে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে।

মনে হয় এখনো যদি সেখানে গিয়ে পড়ে দেখবে তেমনি ভাবে দাঁড়িয়ে আছে ছেলেটা।

বুলা মাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বলে উঠল, 'মাগো, তোমায় কী সুন্দর দেখাচ্ছে।'

বুলার মা হেসে ফেলে বলে, 'হঠাৎ আমাকে সুন্দর দেখাতে যাবে কেন রে? তোর রানুমাসি আমায় চারটি হীরে মুক্তোর গয়না পরিয়ে দিয়েছে নাকি?'

'দিয়েছে, দিয়েছে।' বুলা উচ্ছ্বসিত গলায় বলে, 'তোমার চোখে হীরে, আর দাঁতে মুক্তোর গয়না পরিয়ে দিয়েছে রানুমাসি।'

বুলার মা বলে ওঠে, 'তোর জন্যে রে, তোরই জন্যে। তুই না থাকলে, তুই এমন সুন্দর না হলে, এ গয়না কোথায় পেতাম আমি।'

তারপর বুলার মা আস্তে আস্তে তার আজকের অভিযানের কাহিনী বর্ণনা করে। কী প্রকাণ্ড রাজপ্রসাদের মত বাড়ি, সে-বাড়ির কেমন সাজসজ্জা, বাড়ির গৃহিনী কেমন মধুর সুন্দর।

হেসে হেসে বলে বুলার মা, 'তোর মাসি বলেছে, মেয়ে সুবর্ণ সিংহাসনে বসবে।'

বহুদিন বিস্মৃত মায়ের এই হাসি, উচ্ছ্বসিত কণ্ঠ, এই আলো আলো মুখ বুলাকে যেন অবশ করে আনে, বুলা যেন বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। বুলার হাতেই ওই আলোর উৎসের চাবি।

রাত্রে মা ঘুমিয়ে পড়লে বুলা ওই চাবিটা ঘুরিয়ে দেখতে থাকে। অথচ বুলার মুখটা খুব বিষণ্ণ দেখতে লাগে।

কিন্তু বুলার মা কি সত্যি ঘুমিয়েছিল? বুলার মা'র চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে তার রানুদি। এক সময় বুলার মা বলে ওঠে, বুলা ঘুমুসনি?'

বুলা বলে, 'আমিও ওই কথাটা তোমায় জিগ্যেস করব ভাবছি।'

মা মৃদু হেসে বলে, 'তোর রানুমাসি আমার ঘুম কেড়ে নিয়েছে—'

বুলা হেসে উঠে বলে, 'আর বেচারা আমার? ঘুম কেড়ে নিয়েছে মশা।'

'তুই যে মশারি টাঙাতে চাস না—' বুলার মা উত্তরের প্রত্যাশা না করেই আবার বলে, 'করবিই বা কী, যা গরম। এইবার তোর উপযুক্ত জায়গা তোকে প্রতিষ্ঠিত করে আমার ছুটি। ওদের এক একটা ঘরে তিনটে পাখা। ঘরও অবিশ্যি তেমনি বড় বড়।'

তারপর মা নিজের মনেই বলে, 'ফটো দেখেই তো পছন্দ করে ফেলেছে। সামনের মাসেই দিতে চায়। আমিও না করিনি। কী দরকার? যত তাড়াতাড়ি হয়ে যায় ভালই।'

'মানে যত তাড়াতাড়ি মেয়েটাকে তাড়ানো যায়। কী বল?'

মা মৃদু গভীর গলায় বলে, 'মেয়ে যখন তাড়িয়ে দেওয়ারই জিনিস, তখন ও কথা বলে লজ্জা দিতে পারবি না।'

'আচ্ছা মা, খুব বড়লোক তোমার ভাল লাগে?'

'লাগে লাগে।' বুলার মা আবেগের গলায় বলে, 'তোর জন্যে লাগে। কেবল ভেবে এসেছি—এখন শাপগ্রস্তের মত পড়ে আছি বটে, কিন্তু তোকে যেন উপযুক্ত জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারি। তুই যাঁর জিনিস তাঁর কাছে গিয়ে যেন মাথা হেঁট করে বলতে না হয় তোমার মত করে পারিনি। যেন বড়মুখ করে বলতে পারি—তোমার বুলাকে আমি তোমার মত করেই—'

থেমে যায় বুলার মা। কেন থেমে যায় বুঝতে অসুবিধা হয় না বুলার। বুলা তবে আর কথা চালাবে কী করে?

অনেকক্ষণ পরে বুলার মা বলে, 'তা বলে, তারা কিছু চাইবে না বলে—দুঃখীর মতও তোকে আমি তুলে দেব না তাদের হাতে। আমার সব কিছু প্রাণ কুটে তুলে রেখেছি তোর জন্যে, তোর দাদুই রেখে দিয়েছিলেন 'ভল্টে'। আজ পর্যন্ত সে সব চোখেও দেখিসনি তুই। এক সেট মুক্তোর, এক সেট সবুজ পান্নার, আর সর্বাঙ্গের মত সোনা। আর দাদার বাড়িতে আমার বাবার দেওয়া যে আলমারিটা আছে? সেটা ত শুধু দামী শাড়িতেই ঠাসা। তাছাড়া তোর দাদু তোর বাবার যা কিছু নগদ টাকা ছিল, সব তোর নামে—কী রে

ঘুমিয়ে পড়লি না কি ? এই ছ্যাখ, এতক্ষণ জেগে ছিলি—'

আসলে বুলার মা'র ভিতরটা উদ্বেল হয়ে উঠেছে, কাউকে এই ঢেউয়ের ভাগ দিতে চায়। কতকাল ধরে বুলার মা নিঃসঙ্গ হয়ে বসে আছে, একটা বোবা পৃথিবীর সামনে, তাই এখন কথার সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠতে চাইছে।

এখন বুলার মা নিজে নিজেই কথা বলে, 'এখান থেকে তো আর বিয়ে হওয়া সম্ভব নয়, বানুদিব বাড়ির কাছাকাছি একটা ইস্কুলবাড়ি আছে সেটা নেওয়া যাবে, এখন গরমের ছুটি চলছে।…অনাদিকে একটু ভাল করে বলতে হবে, ক'টা দিন যাতে ওখানে গিয়ে থাকতে পারে। ও আমার ডান হাত। ওকে নইলে কাজ উদ্ধার হবে না।'

লাইব্রেরীর বইটা একটা বড় উপলক্ষ। অনাদি বুলার এই নেশাটির জন্য কৃতজ্ঞ। প্রতিদিন বইটা বদলাতে হয় বলেই না প্রতিদিন আসবার সুযোগ মেলে। প্রতিদিন না এলে কী করেই বা খবর পাবে অনাদি, মাসিমার কী চাই না চাই। নিজে থেকে তো আর কিছু বলবেন না উনি। ইচ্ছে করেই তাই রোগা রোগা বই নিয়ে আসে অনাদি, যাতে একদিনে শেষ হয়ে যায়।

কড়া নাড়াতেই দরজা খুলে দিল বুলা, আর অনাদিকে স্তম্ভিত করে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'তুমি এই নিত্য হাজরে দেওয়াটা একটু কমাবে ?'

অনাদি একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে কী বুঝে কে জানে চড়া গলায় বলে ওঠে, 'আজ আবার কোন্ শূয়ার কী বলে গেছে শুনি ?'

'বলে আবার কে কী যাবে ?' বুলা ভ্রূভঙ্গী করে বলে, 'আমিই বলছি।'

বুলার এই ভ্রুকুটা অদ্ভুত বাহারি। অজিত বিজয় দুলাল তাদের রকের আড্ডায় জমিয়ে বসে যে বলে, 'সব ছেড়ে দিলেও ভুরুতেই মাইরী প্রাণ কেড়ে নেয়।' সেটা অতি উক্তি নয়, তবে অনাদির কানে

এমন অসভ্য উক্তি পৌঁছলে, অনাদি তাদের খুন করে ফেলতে যায়।

আজ কিন্তু অনাদিরই ওই অসভ্য উক্তিটা মনে পড়ে গেল, অনাদি চোখটা নীচু করল। অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, 'এই নে তোর বই।'

বুলা বইখানা হাতে নিয়ে ফরফর করে একবার উল্টে দেখে বলে 'লাইব্রেরিতে এবার আমার নামটা কাটিয়ে দিও অনাদিদা!'

'নামটা কাটিয়ে দেব?'

'তাই তো বলছি। কাঁহাতক আর প্রাণপাত করে চাকরগিরি করবে?'

অনাদি প্রায় চমকে উঠে বলে, 'আমি কোনোদিন বলেছি, আমার কষ্ট হচ্ছে?'

'তুমি কী আর বলবে? সৌজন্য ভদ্রতা আছে তো একটা? আমিই—'

অনাদির হঠাৎ যেন চোখে জল এসে যায়, কষ্টে গলাটা রুক্ষ করে বলে, 'শুধু সৌজন্য ভদ্রতা করেই করি আমি?'

'আচ্ছা না হয় মনের টানেই করলে, কিন্তু পাড়ার এত ছেলে থাকতে একা তোমারই বা এত মনের টান কেন, সেটাও তো ভাববার কথা।'

অনাদির নিশ্চিত ধারণা হয় অনাদির এই রোজ আসা নিয়ে পাড়ার কেউ কিছু শুনিয়ে গেছে। আর তাতেই বুলা ক্ষেপে গেছে।

বলে যাওয়া তো আশ্চর্যও নয়, অনাদির নিজের দিদিই তো সেদিন বলেছে, 'পাড়ার এত ছেলে থাকতে তুইই বা কেন হরবাবুর বাড়ির সব কন্না করিস রে? ওরা তো দিব্যি একখানা বিনি মাইনের চাকর পেয়েছে, ওদের তো পোয়া বারো। তুই কাজকর্ম খুইয়ে বারো মাস ওদের খিদ্‌মদগারি করতে যাবি কেন শুনি?'

অনাদি রাগ চেপে শান্তভাবে প্রশ্ন করেছিল, 'আমি কাজকর্ম খুইয়েছি? বাড়ির কাজ করি না? চাকরি ছেড়ে দিয়েছি?'

'না হয় করছিস সবই বাবা, তবু পাঁচজনে পাঁচকথা বলে যখন'

'ও। তা সেই পাঁচজনের নামটা একবার কর তো শুনি?'

'তা আর নয়', দিদি সভয়ে বলে ওঠে, 'আমি বলি, আর তুমি শেষে খুন করে ফাঁসি কাঠে ঝোল।'

'তার মানে তুই নিজেই বলছিস।'

'মাইরী মা কালীর দিব্যি অনু, বলেছে লোকে। শুনে ভাল লাগে না, তাই সাবধান করে দিচ্ছি।'

'পাঁচজনের কথা বাদ দে। তুই যে রোজ গঙ্গাছান করতে যাস তাতেও তো অনেকে অনেক কিছু বলে, বুঝলি?' বলে বেরিয়ে গিয়েছিল অনাদি।

এখন সন্দেহ হচ্ছে দিদিই কিছু বলে যায়নি তো। তবু অনাদি তাচ্ছিল্যের গলায় বলে, ওই সব বাজে ভাবনা ছেড়ে ভাল কথা ভাব দিকি। সর, মাসিমার সঙ্গে দরকারি কথা আছে—'

'দরকারগুলো তো তোমার নিজেরই সৃষ্টি।'

এবার অনাদি থমকে যায়। বলে, 'অনেক কথাই ভাবতে শুরু করেছিস দেখছি। বেশ, আমি এলে যদি তোর অসুবিধে হয়, আর আসব না।'

'আমার অসুবিধের কথা হচ্ছে না। তুমি রোজ রোজ হ্যাংলার মত এখানে আসবেই বা কেন?'

অনাদি গম্ভীরভাবে বলে, 'এত কথা যখন তোর মনে উদয় হয়েছে, তখন না আসাই উচিত। ঠিক আছে মাসিমাকে বলে যাই—।'

বুলা দরজাটা না ছেড়েই হঠাৎ হেসে উঠে বলে, 'মাসিমা হাওয়া।'

বুলার হাসি দেখে অনাদি ধড়ে প্রাণ পায়। অনাদি বোঝে সবটাই বুলার এক নতুন ধরনের ঠাট্টা। অনাদি আবার নিজ স্বভাবে ফেরে। চড়া গলায় বলে, 'হঠাৎ মাসীমার কী এত রাজকার্য পড়ল রে যে তোকে একা বাড়িতে ফেলে রেখে রোজ হাওয়া হচ্ছেন'?

এদিকে তো শরীর মা গঙ্গা, একদিন কালিঘাটে যেতে পারার ক্ষমতা নেই। কার সঙ্গে যাচ্ছেন? কোথায় যাচ্ছেন? আর কেনই বা যাচ্ছেন?'

এমন ভাবে কথাটা বলে অনাদি যে, অন্য কেউ শুনলে মনে করবে অনাদি বুলার মা'র অভিভাবক।

বুলা কি মুখের ওপর বলে বসবে সে কথা? বুলা কি ওই মুর্খটাকে চৈতন্য করিয়ে দেবে? বুলা নিষ্ঠুর, তবু বোধ করি অতটা নিষ্ঠুর হতে পারে না। তাই বুলা আঙুলে কর গুণে গুণে বলে, 'কার সঙ্গে যাচ্ছেন? যাচ্ছেন রানুমাসির সঙ্গে, মানে আমার মাসি। কোথায় যাচ্ছেন? তাঁর বাড়ি, এবং তার সঙ্গে অন্য এক বাড়ি। কেন যাচ্ছেন? সেটাই তো সেদিন বলেছি—মাথার পাহাড় নামাতে। হল বোঝা?'

'শেষটা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে। সেদিনও এই রকম কী যেন বললি একটা মানে বুঝছি না।'

'না বুঝলে আর আমার দায়িত্ব নেই।' বুলা বলে, 'মোটের মাথায় তোমার এই চাকরগিরি আমার ভাল লাগছে না' তাই বলে দিচ্ছি এটা কমাও।'

অনাদি এবার আরো গম্ভীর হয়। বলে, 'খালি খালি চাকরগিরি চাকরগিরি কথাটা বলার মধ্যে কোনো সভ্যতা প্রকাশ পাচ্ছে না বুলা। এসব কাজ দাদু থাকতে দাদুও করতেন। আমার নিজের বাড়িতেও আমি করি।'

বুলা অন্য দিকে তাকিয়ে উদাস গলায় বলে, 'কিন্তু অনাদিদা, তোমার মত চিত্তের লোক তো সংসারে অনেক নেই, তাই সোজা হিসেবটাও বাঁকা হয়ে দাঁড়ায়।'

'আমি ওসব বাঁকাচোরা ধার ধারি না বুলা!'

'কিন্তু আমাকে যে ধার ধারতে হয় অনাদিদা!'

'তোকে আমি ঠিক এরকম ভাবতাম না! এসবের অনেক উঁচুতে

ভাবতাম। তোকে আর মাসিমাকে।'

'এখন তাহলে নীচুতেই ভাবছ?'

'এখন কিছুই ভাবছি না। মাসিমার সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত—'

অনাদির ভগবান বোধ করি হঠাৎ প্রখর শ্রবণশক্তি সম্পন্ন হয়ে উঠলেন, অনাদি ঘুরে দাঁড়িয়ে সাইকেলের হ্যাণ্ডেল ধরতেই দেখতে পেল তার প্রার্থিতজন সামনেই। বুলার মা আসছেন। কিন্তু নুনে বালির মত তাঁর সঙ্গে একটি ঝকমকে থপথপে ধপধপে মহিলা। তার মানে ইনিই বুলার মা'র বান্নুদি। বুলার বান্নুমাসি।

এক নজরেই বোঝা যায় রীতিমত ধনী গৃহিণী। নেহাৎ এ গলিতে বড় গাড়ি ঢোকে না বলেই পায়ে হেঁটে আসছেন।

অন্য দিকে বুলার মা বলে ওঠে, 'এই যে অনাদি, তোমার কথাই ভাবছিলাম। কথা আছে তোমার সঙ্গে। আসছ না চলে যাচ্ছ?'

অনাদি আস্তে বলে, 'চলেই যাচ্ছিলাম আপনি ছিলেন না—'

'আচ্ছা পরে এস, বুঝলে? একটু সময় হাতে নিয়ে এস, কেমন?'

বুলার মা রান্নুদির সঙ্গে ঢুকে যান ভিতরে।

অনাদি একটু মনমরা হাসি হেসে বুলার দিকে তাকিয়ে বলে, 'কি করতে বল? আসব কি আসব না?'

'ওরে বাবা! হেড অফিসের অর্ডার। আমি কোন্ ছার।' বলে বুলা ভুরুতে তেমনি একটা ভঙ্গী করে দরজা বন্ধ করে ভেতরে চলে যায়।

অনাদি দাঁড়িয়ে থাকে দু'মিনিট, অনাদি যেন বন্ধ দরজার ওপিঠে একটা রহস্যময় ঘটনার আভাস পায়। অনাদির সাইকেলের বেলটা আটকে যায়।

রান্নুদি বললেন, 'কী মেয়েকে কী ছিরি করে রেখেছিস আঁদু?

দেখে ঠিক মনে হচ্ছে গোবরে পদ্মফুল। এই বাড়ি-ঘর এই পাড়া, এ কী ওর যুগ্যি ?'

বুলা মাসির জন্যে চা বানাতে যাচ্ছিল। বুলা বলল, 'মেয়েটা তো আসলে এই গলির, এই বাড়ির ?'

'সে তোমার মা'র অদেষ্টের ফের। নইলে তুমি যে কী দামের সে তো আমার অজানা নয়। দেখে এসেছি নিজের চক্ষে। তোর মনে আছে আন্নু, সেবার যখন ডিব্রুগড়ে তোর ভগ্নিপতির অফিসের ডিরেক্টরস মিটিং হল, আমি তোর সঙ্গে দেখা হবার লোভে ওর সঙ্গে গিয়ে তোর কাছে তিনদিন থেকে এলাম ? তোর কী মনে আছে বুলা ? তেমন মনে নেই হয়তো। খুব ছোট ছিলি। আহা, কী বাড়ি কী বাগান! চারিদিকে কী প্রাকৃতিক শোভা! আর তোর বাবা ? কী মানুষই ছিলেন। অমন সুন্দর প্রকৃতির মানুষ জীবনে আর দুটি দেখলাম না। এখানে থাকা তোর একবগ্‌গা দিদির জেদে। নইলে তিনিই কি আর চেষ্টা করলে এখান থেকে উদ্ধার পেতে পারতেন না ? সাধে আর বলছি, সবই তোর মায়ের অদেষ্ট।...যাক্ এবার সকল দুঃখের নিরসন হবে। মেয়ে রাজরাণী হবে।'

বুলাকে বাচাল বলতে হয় এবার ? না হলে অত বড় মাসিমার সামনে কট্‌কট্ করে বলে, 'মেয়েকে চোখে না দেখেই রাজরাণীর পোস্ট !'

রানুমাসি অবশ্য রাগেন না, হেসেই বলেন, 'ছবি দেখেই মুচ্ছো গেছে রে! আস্ত মানুষটাকে দেখলে তক্ষুনি ঘরে পুরত, আর ফেরৎ দিত না।...যাই হোক, তুই সব গুছিয়ে ফেল আন্নু, এখান থেকে যত শীগগির পারিস চল আমার ওখানে।'

'আপনার ওখানে ?' বুলা চায়ের পেয়ালাটা নামিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেই বলে, 'কেন আপনার ওখানে কেন ?'

'শোন কথা। বলে কিনা কেন। তা তোদের এখান থেকে বিয়ে হবে ? এই পচা গলি থেকে ?'

বুলা স্থির গলায় বলে, 'এ পাড়ায় মেয়েদের বিয়ে হচ্ছে না? দাছুর বাড়িটা তো তবু দোতলা। একতলা বাড়িও রয়েছে।'

রাস্তুমাসি হা হা করে হেসে মুখে কিঞ্চিৎ পান দোক্তা ফেলে বলেন, 'থাকবে না কেন বাছা, তাদের তেমনি তেমনি বরই এসেছে। কথায় বলে রাজার জন্যে রাণী, কানার জন্যে কানী। তোমার যে বর হবে সে এরকম গলিতে জন্মে পা-ই ঠেকায়নি।'

বুলা শান্ত গলায় বলে, 'তাহলে আর রাণী হওয়া হবে না মাসি। রাজবাড়িতে গিয়ে ঢুকলেও মাঝে মাঝে দুঃখিনী মা'র কুঁড়েয় আসতে তো হবে আমাকে?'

'আহা সে পরের কথা পরে। এখন হচ্ছে কুটুম কাটুম বন্ধুবান্ধব ছিষ্টি নিয়ে বিয়ে করতে আসা। এখন তাদের কাছে মান রাখতে হবে তো। তুই যে কার মেয়ে, কী বাপ ছিল তোর—সে কি অত সবাই বুঝবে? এখন এর থেকে বেরিয়ে না গেলে।'

বুলার মা মেয়ের মুখের দিকে তাকায়। বুলার মা সাবধানে বলে, 'ও কথা বাদ দিলেও এ বাড়িতে জায়গা কোথায় রে বুলা? জীবনে আমার এই একবারই কাজ। সবাই আসবে তো। তোর মামা মামীরা, তোর বাপের দিকেও যারা আছে-টাছে। ও পরামর্শ রাখ রাস্তুদি, এখন কাজের কথায় এস। গয়নাগুলো বার কর।'

বুলার মা রাস্তুদির গাড়িতে তাঁর সঙ্গে গিয়ে ব্যাঙ্কের ভল্ট থেকে তার গহনাপত্রগুলি নিয়ে এসেছে। সেগুলি বার করে দেখা দরকার, কিছু কিছু অদল বদল করতে হবে কিনা।

রাস্তুদি তাঁর হাতের ঢাউস শ্রীনিকেতনী ব্যাগটা চৌকির উপর নামিয়ে তার মুখ খুলতে খুলতে বলেন, 'বুলা চলে যাচ্ছিস কেন, গয়নাগুলো ছাখ।'

'আমি দেখে কী করব মাসি?'

'তা তুইই তো পরবি বাছা। ও তো কোনোদিন অঙ্গেই ঠেকাল না। বিয়ে হয়ে ইস্তক বিদেশবাসী, সেখানে ওসব নিয়েই যায়নি।

বরাবর তোর দিদিমার আলমারিতে থেকেছে। আর ছুটিছাটাতে এলেও, বিয়ে বাড়ি-টাড়ি হলে তবে তো জড়োয়া গয়না পরার সুযোগ? ভোগই হল না।'

বুলা একবার মা'র মুখের দিকে তাকায়। মা জানলার বাইরে তাকিয়ে আছে। বুলা বলে, 'এত অঙ্ক কসে তবে ভোগ! তেমন জিনিসে কি দরকার মাসি বলতে পারেন? অর্থের অপচয় ছাড়া আর কিছু?'

রানুমাসি এ যুক্তিতে দমেন না। একগাল হেসে বলেন, 'তা কেন বাছা? সময়ে কাজে লাগে। এই যে তোমার মা'র ছিল, তাই না আজ তোমায় সাজিয়ে দিতে পারবে? না থাকলে দিতে পারত?'

'না দিলে বিয়ে হতো না বলছেন?

মাসি তাড়াতাড়ি বলেন, 'আহা তা বলব কেন? বিধাতা পুরুষ তো তোকে আসল অলঙ্কার দিয়েই পাঠিয়েছে। তবু তোর মা'রও তো একটা সাধ আছে। লোকের কাছে মুখ থাকা আছে। আজই না হয় ভাগ্যচক্রে এমন অবস্থা, তোর মামাদের সঙ্গেও তেমন ইয়ে নেই, নচেৎ আনুর কি আজ তোকে পুরণো গয়না দিয়ে সাজাবার কথা? তবে হ্যাঁ, আছে বলেই তো বড় মুখে বড় ঘরে মেয়ে পাঠাতে পারবে?'

বুলা আস্তে বলে, 'শুধু মেয়েটার কোনো দাম নেই, না মাসি?'

মাসি এত ঘোরপ্যাঁচ জানেন না, তিনি আর একটা পান গালে ফেলে হেসে বলেন, 'সে দাম যথাস্থানে বাছা। সেটা আর মা মাসিতে কী বলবে?'

মাসি গহনাগুলি বার করেন একে একে। এক একটি কেস খুলে ধরেন, তারও মুখটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, এইগুলি তাঁর ননদের বাড়িতে গিয়ে ঢুকবে। ননদ বলতে পারবে না, 'বৌদি এমন মেয়ে গছালে যে ডোমের চুপড়ি ধোয়া।'

বুলা ওইগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে যেন অতীতে হারিয়ে যয়ে। মাকে কি কোনোদিন পরতে দেখেছিল এসব? মনে পড়ে না। মনে পড়ে মা কত সুন্দর দেখতে ছিল। এসব পড়লে মাকে নিশ্চয় মহারাণীর মত দেখাত। মা'র কত আশার জিনিস ছিল এগুলো। ভোগ হয়নি। প্রাণ ভরে এই সমস্ত মা বুলাকে দিয়ে দেবে।

বুলা একটা ছেলেমানুষের মত কথা বলে, 'বাঃ, মা'র সব জিনিসগুলো অন্য লোকদের দিয়ে দেবে কেন মা?'

বুলার রানুমাসি হেসে ওঠে, 'আনু, তোর মেয়ের কথা শোন। অন্য লোকদের কী রে? নিজের মেয়েকেই তো দিচ্ছে। যাতে সবচেয়ে সুখ। এতদিন যত্ন করে তুলে রাখা সার্থক হল। ওদের বারোমাস ঘটা-পটা, কত বড় বড় লোক কুটুম-কাটুম, নিত্যি বিয়ে পৈতে ভাত সাধু, ভোগ হবে।'

বুলা চঞ্চল হয়ে উঠে পড়ে বলে, 'শুনে-টুনে আমার কেমন দম আটকে আটকে আসছে মাসি, আমি একটু ওঘরে যাই।'

বুলার দম আটকে আসছিল। বুলার মনে হচ্ছিল মা মাসিতে মিলে ষড়যন্ত্র করে বুলাকে একটা খাঁচার মধ্যে চালান করে দেবার চেষ্টা করছে। বুলা কি শুধু তার মায়ের মুখ চেয়ে অসহায় আত্ম-সমর্পণে ওই খাঁচাটার মধ্যে ঢুকবে?

অথচ বুলা জানে এখন চেনাজানা জগতে সবাই বুলার ভাগ্য দেখে ধন্যি ধন্যি করবে। বুলা এতজনের মত না হয়ে, নিজে কী স্বতন্ত্র হতে যাবে?

বুলা কত সুখে ছিল! বুলার ওই রানুমাসি কোথা থেকে এল?

অনাদি অনেকদিনের পর ওদের রকের আড্ডায় এসে বসল।

ওরা বলল, 'কী ব্যাপার, আজ আমাদের কপালের কী খোলতাই মাইরী। প্রভু এসে আসরে বসলেন। সুইটহার্টের বাড়ির কী খবর দাদু? চিলে ছোঁ দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে?'

অনাদি হতাশ গলায় বলে, 'তোরা এই রকম অসভ্যতা করিস বলেই আর তোদের কাছে আসি না।'

'আরে বাবা, অসভ্যতার কী দেখলি? বন্ধু মানুষ, তার সঙ্গে এটুকু ইয়ার্কি মারতে পাব না?'

'সে আমায় যা ইচ্ছে বলতে পারিস, কিন্তু অন্যকে নিয়ে কেন?'

'আহা আহা চুক চুক। শুধু তোকে নিয়ে? তাহলে তো হরিনামের আখড়া খুলতে হয় যাদু। মেয়েছেলের নামটুকু পর্যন্ত চলবে না, এ যে একেবারে আশ্রম দি শঙ্করাচার্য! মেয়েছেলে বস্তুটা যে কী আজ পর্যন্ত তাই তো জানলাম না দাদা; চাল-চুলোর ছিরি নেই, চাকরি নেই বাকরি নেই, কোন্ হতভাগা আমাদের হাতে মেয়ে দেবে বল? অতএব বিয়ে ইহজীবনে হবে না। অন্য লাইনেও উঁকি দেবার মুরোদ নেই। না টাকা, না সাহস। তাই দুটো বোলচাল মেরে জিভে একটু রস আনি প্রভু।...তুমি তো বাবা দিব্যি নিত্য একখানি বিশ্বসুন্দরীর দর্শন পাচ্ছ, কথা বলছ হাসছ, বাজার করে ফেরার ছুতোয়—খাসা একখানি বিজিনেস খুলেছ মাইরী। তুমি আর আমাদের মর্মজ্বালা কী বুঝবে?'

'এ প্রসঙ্গ রাখ বিজয়।'

'রাখছি প্রভু, রাখছি। অন্যে তার প্রসঙ্গ তুললেও গায়ে ফোস্কা পড়ে বুঝছি। অবস্থা কোথায় গিয়ে ঠেকেছে ছাখ তোরা। তবে দুঃখ এই মাইরী, তুই কিছু আর কন্দর্পকান্তি নোস, আর আমরাও সকলেই এমন কিছু ওরাঙওটাঙ নই, অথচ—। একেই বলে ললাট। এখান দিয়ে যায় আসে, আমাদের দিকে এমন চোখে তাকায়, যেন কালীঘাটের কুঠে ভিখিরি দেখছে।'

'তোরা ভিখিরির মত হ্যাংলামি করিস তাহলে।' অনাদি বলে।

'আমাদের হ্যাংলামি তো প্রভু শুধু পথে বসে বসে। আপনার কায়দা আলাদা। কেমন জম্পেস হয়ে বসে আছেন।'

অজিত বলে ওঠে, 'তবে আর বেশীদিন নয় হে, ভিটেয় এবার

ঘুঘু চড়বে। ঘুঘুর ডাক শোনা যাচ্ছে। ওই যে একখানি জগদ্দল মহিলা ইয়া বড় গাড়ি চড়ে আসা যাওয়া করছেন, মাদারকে নিয়ে যাচ্ছেন। নির্ঘাৎ উনি কিছু ঘটনা ঘটাচ্ছেন।'

অনাদির চোখের সামনে থেকে যেন একটা পর্দা খসে যায়, অনাদি নিজের মনে গালে ঠাস-ঠাস করে চড় মারে! 'কী বুদ্ধু আমি! কী বুদ্ধু। এই সহজ কথাটা বুঝতে পারিনি আমি?'

বুলা যখন বলেছিল বাড়ি গিয়ে ভেবো, তখনও না, ওই মাসিটিকে দেখেও না। অথচ বিজয় দুলাল অজিত শুধু বকে বসেই সব বুঝে ফেলেছে। ছি ছি।

আস্তে আস্তে মনে পড়ে অনাদির, বুলার মা বলেছিলেন, তোমার সঙ্গে কথা আছে, তার মানে বুলার বিয়ের কাজকর্ম খাটা-খাটুনির কথা। পাড়ার মধ্যে একমাত্র অনাদিকেই বুলার মা বিশ্বাস করেন, নির্ভর করেন।

যেতেই হবে। যদিও বুলা বারণ করেছে। তবে একেবারে বারণ করেনি। বেশী বেশী যেতে বারণ করেছে। ভাগ্যিস একেবারে করেনি। সেটা করে বসলে যাওয়া কঠিন হতো। মাসিমা তাহলে কী ছোটলোক ভাবতেন।

অবিশ্যি ছোটলোক ছাড়া আর কী অনাদি? বলতে গেলে মিস্ত্রীর ছেলে। বাবার ওই পাম্প সারাইয়ের দোকানটায় যখনই মিস্ত্রীর ঘাটতি ঘটে, বাবাকেই ছুটতে হয় যন্ত্রপাতি হাতে নিয়ে।

অনাদির মা নেই। থাকলে নিশ্চয়ই হরিপদ কাকার বৌয়ের মত ঘড়া-বালতি নিয়ে রাস্তার টিউবওয়েল থেকে জল আনত। অনাদির বিধবা দিদি পাশের বাড়ির কাদের সঙ্গে যেন ভাব পাতিয়ে তাদের কল থেকে জল নিয়ে আসে।

অনাদি পার্ট টু পরীক্ষা দিয়ে ফেল মেরে কর্পোরেশনে একটা কাজ জুটিয়ে নিয়ে কোনোমতে বেকারত্বের জ্বালা থেকে বেঁচেছে। অনাদির সব বন্ধুরা এমন ভাষায় কথা বলে যে অনাদিরই শুনলে

অরুচি আসে। এই অনাদিকে ছোটলোক বলতে হবে না তো কি ভদ্রলোক বলতে হবে?

তবু নিজে অনাদি ছোটলোকের মত ব্যবহার করতে পারবে না। মাসিমার মেয়ে খামখেয়ালের বশে যেতে নিষেধ করেছে বলে, মাসিমার ডাককে অগ্রাহ্য করতে পারবে না।

'প্রভুর হৃদয়টা একদম ভেঙে গেল যে বিজয়। মাইরী, ওসব গোলোকের গোপন কথা এক্ষুণি শোনাতে গেলি কেন? বেশ আহ্লাদে ডগমগ করতে করতে যাচ্ছিল, জানতও না পাখি ভাগছে। হঠাৎ শুনে স্রেফ বুক ভেঙে গেল।'

অনাদির ইচ্ছে হল সবক'টার নাকে এক একটা প্রচণ্ড ঘুসি মেরে সামনের তাসগুলো কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে যায়, তবু কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে শান্ত ভাবে বলে, 'তোরা কি সত্যিই চাস আমি আর কখনো তোদের কাছে এসে না বসি?'

অজিতের মুখের সেই হ্যা হ্যা ভাবটা বদলায়। অজিত সাবধানে বলে, 'তুই যে ঠাট্টা বুঝিস না, এই তোর একটা বড় ডিফেক্ট অনাদি। নেহাৎ পেটরোগারাই ঠাট্টা হজম করতে পারে না। থাক, ওকে আর জ্বালাসনে বাবা তোরা। যেতে দে বৃন্দাবনে।'

অনাদি উঠে যায়। অনাদির ইচ্ছে করে না এই মুহূর্তে বুলাদের বাড়িতে যায়। কিন্তু অনাদি পারে না, আস্তে আস্তে বুলাদের বাড়িতে ঢুকে যায়। আজ বুলার মা'র সঙ্গেই আগে দেখা, অনাদির মনে হয় আজ আমার ভাগ্য ভাল।

বুলার মা হৃষ্টচিত্তে বললেন, 'এসেছ বাবা, বোসো, অনেক কথা আছে। বুলা, কাল তোর রাণুমাসি যে মিষ্টি এনেছিল দুটো দিয়ে জল দে অনাদিকে।'

অনাদি মাথা নাড়ে।—'এখন আর মিষ্টি না মাসিমা।'

বুলার মা ছাড়ে না। বলে, 'রোজ তো আর তোমায় আমি খাওয়াচ্ছি না, আজ ঘরে রয়েছে, তাই—'

বুলা এসে বিনাবাক্যব্যয়ে এক গ্লাস জল আর দুটো সন্দেশ দিয়ে চলে যায়।

বুলার মা মৃদু হেসে বলে, 'মেয়ের রাগ হয়েছে! অসঙ্গত রাগ। আচ্ছা তোমরাই বল, মেয়ের বিয়ে দিতে হবে না? বুলার যে বিয়ে গো বাবা?'

আজ হঠাৎ এত গরম লাগছিল অনাদির, অনাদি আজ যথারীতি সময়ে বাড়িতে না ফিরে পার্কের বেঞ্চে গিয়ে বসে রইল। এত গরম বলেই বোধহয় খিদে নেই আজ। অনাদি তাই গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বসে ভাবে অনেক কিছু।

মাসিমা বলেছেন তিন-চারটে দিন অনাদিকে কোথায় যেন সেই ইস্কুলবাড়ি ভাড়া-করা বিয়ে বাড়িতে গিয়ে থাকতে হবে।

অনাদির কর্পোরেশনের চাকরিতে ছুটি পাওয়া সহজ, তাই বুলার মা'র এই অনুরোধ। বুলার মা বলেছেন, অনাদি তার ডানহাত, অনাদিকে না হলে বুলার বিয়ে হবে না। বিয়ের কেনাকাটা অবিশ্যি বুলার মা তাঁর রাণুদির সঙ্গে করবেন রাণুদির অ্যাম্বাসাডার গাড়ি চড়ে। কিন্তু কেনাকাটা ছাড়াও তো আরও অনেক কাজ আছে বিয়েতে।

প্রথম থেকেই ধর না কেন ইস্কুলবাড়িটা ভাড়া নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িটা ধোওয়া মোছা করতে হবে, দরজাগুলোর খিল ছিটকিনি আছে কিনা পরীক্ষা করে ব্যবস্থা করতে হবে, কাঁচা বাজার মাটির বাসন কেনা মিষ্টির ছানা কেনা, মাছ দইয়ের জোগাড়, এসব মোটা আর ভারী কাজের ভার আর কাকে দেবেন বুলার মা অনাদিকে ছাড়া?

ডেকরেটর ঠিক করা, রাঁধুনী ঠাকুর ঠিক করা—এসব অবিশ্যি রাণুদিরাই করবে। ওদের বারোমাস কাজকর্ম হয়, তবু তাদের

তদারকী করা তো একটা বড় কাজ। তবে রান্নার জায়গায় একজন দায়িত্বশীল লোক ঠায় বসে না থাকলে তো সবই লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে।

তারপর গিয়ে ফুলশয্যার তত্ত্বর সঙ্গে লরীর ভার নিয়ে কোনো একজনের যাওয়া চাই। বুলার মা'র ভাইপো বোনপোরা তো আর ওই সব ওঁচা কাজ করতে চাইবে না? অথচ শুধু চাকর-বাকরদের ভরসায় সব কিছু পাঠানো চলে না।

কাজের ফিরিস্তি শুনিয়েই চলেছিলেন বুলার মা। বুলা মাঝে মাঝে ফোড়ন কেটেছে, যথা, 'মা, একটা কাজ বলতে ভুলে গেলে মা। পাতা গেলাস ফেলবার লোক না পেলে—তাড়াতাড়ির সময় টেবিল সাফ্ করতেও তো লোক চাই?···জলের ড্রামগুলো ঠিক সময়ে ভরিয়ে রাখার কথা বলনি মা।···ও অনাদিদা, মা একটা মস্ত কথা বলতে ভুলে গেছে—বর যখন গাড়ি থেকে নামবে, তখন তার কোঁচাটা যাতে মাটিতে না লুটোয় তাই একজনের কোঁচাটি ধরে আনা নিয়ম—ওটা অনাদিদা ছাড়া আর কে পারবে! শুনেছি বরযাত্রীদের ফাইফরমাসের জন্যে লোক মোতায়েন রাখা বিধি, তা, আমাদের আর লোক কোথায় বল অনাদিদা তুমি ছাড়া? মা বোধহয় ওটা বলতে লজ্জা পাচ্ছে। লজ্জা পাবার দরকার নেই মা। লজ্জা ভীরুর লক্ষণ।'

বুলার মা মেয়ের এইসব কড়া ঠাট্টাতেই লজ্জা পেয়ে বলেছেন, 'তোর নিজের বিয়ের কথায় তোর এত কথা কইবার দরকার কী রে? তুই যা তো। যা, অনাদির জন্যে চা বানিয়ে নিয়ে আয়। কই, মিষ্টি দিলি জল দিলি না?'

বুলা চা নিয়ে এসে বলেছিল, 'তা বিয়ের একটা কোনো কথাতে তো থাকতে হবে মা পাত্র ঠিক করার কথাটা না হয় তোমাদের ডিপার্টমেন্ট, আমার অনধিকার চর্চা, পাতা কুড়নো, ঘর-ঝাঁটানো এ সব কথায় কথা কইতে দোষ কি?'

অনাদি অবশ্য বুলার আবোল তাবোলে কান দেয়নি। বুলার মা'র কথাগুলোই মন দিয়ে শুনেছে। যেটা কেজো কথা, দরকারি কথা।

কাজগুলো কী ভাবে ম্যানেজ করবে। কোন্‌টা কোন্‌ বেলায় করবে, কদিন ছুটি নেবে। এই সব ভাবতে ভাবতে কখন যেন অনাদি সেই রাজপ্রাসাদের মত বাড়িটায় চলে গেল। অনাদি কোনো মন্ত্রপূত ভস্মলেপন করেনি। তবু অনাদি অদৃশ্য হয়ে সেই বাড়িটার সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে লাগল।

অনাদি দেখতে পায় বুলা নামের আটপৌরে মেয়েটা সম্পূর্ণ পোশাকি হয়ে গিয়ে হীরে মুক্তো ঝলমলিয়ে স্বর্ণ সিংহাসনে বসে রয়েছে। বুলার মাথার ওপরকার ছাদে তিনখানা পাখা ঘুরছে। বুলার পায়ের নীচে মখমলের পাপোস, সেই পাপোসের ওপর বুলার পায়ের জরির চটিটা ছাড়া রয়েছে। বুলা যখনই উঠবে ওটায় পা গলিয়ে নেবে। বুলা আর মাটিতে পা ফেলবে না। বুলার বিছানায় এক হাত উঁচু ডানলোপিলোর গদি, বুলার খাটে লেসের ঝালর দেওয়া সিল্কনেটের মশারি, বুলার বালিশে চাদরে ফুললতা-কাটা।

বুলা সেই বিছানায় রাজপুত্রের সঙ্গে মৃদু গুঞ্জনে রাত কাটাচ্ছে। ...বুলার গায়ে শ্বেত চন্দনের সুরভি। বুলার গলায় বাজারের সেরা ফুলের মালা।

অনাদি অদৃশ্য হয়ে বেড়াচ্ছে, তাই বুলা তাকে দেখতে পাচ্ছে না। অনাদি যখন হঠাৎ তার পিছনে দাঁড়িয়ে পড়ে কানে কানে বলে উঠছে—'দেখলে তো বুলা, বলিনি আমি, তোমায় শুধু রাজ-প্রাসাদেই মানায়। দেখ কেমন মানিয়েছে। ওই তো তোমার সামনে লম্বা আর্শী, দেখ তাকিয়ে।'

বুলা চমকে গিয়ে এদিক ওদিক তাকাবে। মানুষটাকে দেখতে পাবে না, শুধু কথা শুনতে পাবে, এতে ভীষণ অস্থির হয়ে উঠবে। বুলা হয়তো ভয় পাবে।

অনাদি তখন সাহস দিয়ে বলবে, 'ভয় নেই বুলা, আমি। আমি অদৃশ্য হয়ে বেড়াচ্ছি, তাই তুমি আমায় দেখতে পাচ্ছ না। কিন্তু অদৃশ্য না হলে তোমার কাছাকাছি এসে যাব কী করে? তোমার শ্বশুরের দেউড়িই পেরোতে পারতাম না, তা একেবারের তোমার শোবার ঘর।'

আচ্ছা, এতে বুলার চোখ দিয়ে বড় বড় ফোঁটার জল পড়বে কেন? আর সে-জল অনাদির গায়েই বা এসে পড়ছে কী করে? অথচ পড়ছে, পড়েই চলেছে, অনাদি গালে কপালে হাত বুলিয়ে টের পেল ভিজে ভিজে। তারপর জলটা বাড়তে লাগল, হুড়মুড় করে পড়তে লাগল।

অনাদি ধড়মড় করে উঠে বসল। দেখল পার্কের সব বেঞ্চি ফাঁকা হয়ে গেছে, জোর বৃষ্টি পড়ছে। ওঃ! এই জোর বৃষ্টিটা আসবে বলেই সন্ধ্যাবেলায় অত গুমোট গরম হয়েছিল। অত গরমেও অনাদি ঘুমিয়ে পড়েছিল?

বাড়িতে যখন ফিরল অনাদি, তখন ভিজে চুপচুপে!

দিদি রেগে চেঁচিয়ে একসা করে বলে, এই ঝম্‌ঝম্‌ বৃষ্টিতে কোথায় ছিলি শুনি? রাত এগারোটা বেজে গেছে। বাবা তোকে খুঁজতে বেরোচ্ছিলেন, আমি একটা বাজে ভাঁওতা দিয়ে নিবৃত্ত করে খাইয়ে শুইয়েছি। তাও একটু সন্দেহ করছিলেন। বললেন, 'বন্ধুর বিয়েতে নেমন্তন্ন যাবে তো অমন হতভাগার মত সাজ করে গেল কেন? একটা ফরসা শার্ট পায়জামাও জোটেনি? বেরোবার মুখে বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছিল বুঝি?'

অনাদি ও কথার কোনো উত্তর না দিয়ে বলল, 'একটা গামছা তোয়ালে কিছু দে দিকি।'

'এই তো, হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। নাও এখন জ্বর-জারি না বাধিয়ে বস' দিদি গজগজ করতে করতে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে যায়।

অনাদি বুঝতে পারে দিদি তার জন্যে না খেয়ে বসে আছে, কিন্তু অনাদি কী করে খাবে? অনাদির যে আদৌ খিদে নেই। রান্নাঘরের সামনে এসে দাঁড়াল, বলল, 'দিদি তুই খেয়ে নে, আমার খিদে নেই।'

দিদি ফোঁস করে উঠল, 'কেন, সত্যি সত্যি বন্ধুর বিয়ের নেমন্তন্ন ছিল না কি? খিদে নেই। বাইরে কিছু অপথ্যি কুপথ্যি করেছিস বুঝি?'

'কী যে বলিস।' বলে অনাদি দাঁড়িয়ে পড়ে বলে, 'ঠিক আছে, দেখি কী দিবি।' ভাবে, অনিচ্ছেয় কথা কাটাকাটির থেকে, অখিদেয় খানিকটা খেয়ে নেওয়া ঢের শান্তির।

অনাদি যখন চলে এল, তখন বুলুর মা ক্ষুব্ধ গলায় বুলাকে বলল, 'অনাদির সামনে অমনভাবে কথা বলছিলি কেন বুলা?'

বুলা অবাক গলায় বলে, 'ও মা, কেমনভাবে আবার?'

'কেমনভাবে, তা নিজেই ভেবে দেখ। আমি ওকে চাকর দারোয়ান মুটের মত খাটাই? ঘরের ছেলের মত হয়ে গেছে, ওর ওপর তাই অনেকটা নির্ভর করি। ও সেটা বোঝে বলেই কুণ্ঠা লজ্জা না করেই ওকে ওই ভারগুলো দিচ্ছিলাম। আমার দিকে টেনে কাজ করবে, এমন আত্মীয় আমার কে আছে বল? রাণুদি আমার অনেক উপকার করেছে, কিন্তু এই সব ছোট ছোট কাজের ভারও ওদের ওপর চাপানো কি সঙ্গত?'

'আহা আমি কি বলেছি সঙ্গত?' বুলা হেসে উঠে বলে, 'ছোট কাজের জন্যেই তো ছোট মানুষরা। তবে তুমি কিছু কিছু ভুলে যাচ্ছিলে, তাই মনে করিয়ে দিছিলাম। শেষে আবার বলবে, ওই যাঃ ওটা তো বলা হল না।'

'তোর বলার ধরণটা খুব খারাপ হয়েছে।' বুলার মা বলে, 'অনাদি আবার কী মনে করল কে জানে।'

'মন থাকলে তো মনে করবে?'

বুলার মা একটুক্ষণ চুপ করে মেয়ের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে, 'ওকে অত হেনস্থা করা খুব অন্যায় বুলা। ও এ-পাড়ার ওই রকবাজ ছেলেগুলোর মত নয়, ওর মধ্যে বস্তু আছে।'

বুলা তবু হেনস্থার গলাতেই বলে, 'সেটা তোমার দিব্যদৃষ্টিতেই ধরা পড়ে। আমি তো একটা ডাহা বোকা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাই না।'

'তোরা এ-যুগের ছেলেমেয়েরা পরের উপকার করাটাকে পরম বোকামী ভাবিস, তাই ও ছাড়া আর কিছু দেখতে পাস না।' বুলার মা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'তোর দাদু মারা যাবার পর থেকে অনাদিই আমাদের রক্ষা করে আসছে। সেটা বুঝতে পারিস? অনাদি না থাকলে আমাদের এ পাড়ায় বাস করা সম্ভব হতো কিনা কে জানে। পাড়ার আর সব ছেলেগুলোকে দেখিস তো? অনাদির ভয়ে কেউ একদিন এতটুকু বেচাল করতে সাহস পায় না, সেটা বুঝিস?'

কিন্তু মায়ের এত বুঝ দেওয়া সত্ত্বেও বুলা বোঝে বলে মনে হয় না। বুলা অক্লেশে বলে, 'বললাম তো বাবা তোমার মত আমার দিব্যদৃষ্টি নেই।'

'তার মানে তুই ওকে মানুষ বলে গণ্য করিস না। দেখেছি অনেকদিন, ওর জন্যে একটু চা করতে বললে বেজার হয়ে করে দিস, ও ভারী ভারী মোটগুলো বয়ে আনলে একবার 'আহা, বলতে জানিস না। সব সময় কেমন একটা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ভাব। বেশ, বোকাই যদি হয় তাতে সে ছোট হয়ে যায় না বুলা। বরং তাকে ছোট করে বুদ্ধিমানরাই ছোট হয়ে যায়।'

'ঠিক আছে বাবা কাল থেকে খুব মান্য করে চলব।'

'সেটাও ব্যঙ্গ করা হবে বুলা। তাছাড়া ও আর আসবে কি না তাই সন্দেহ হচ্ছে। তখন যদি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতিস তো বুঝতে পারতিস কতটা আহত হয়েছে। মুখের রংটা একেবারে কালো হয়ে গেছিল।'

বুলার মা একটু থেমে বলে, 'বিশেষ করে তোর এখন একটু বুঝে-সুঝে কথা বলা উচিত। নইলে ভাবতে পারে—মস্ত বড়লোকের বাড়িতে বিয়ে হচ্ছে বলে বুলা অহঙ্কারী হয়ে যাচ্ছে, মানুষকে মানুষ জ্ঞান করছে না।'

'ওরে বাবা!' বুলা মাথায় হাত দিয়ে বলে, 'তুমি যে আমার ভয় জন্মিয়ে দিচ্ছ মা। এবার থেকে তো তাহলে নিক্তি-টিক্তি ধরে কথা বলতে হবে?'

'তোর যেন কী হয়েছে'—বুলার মা বলে, 'কথাবার্তার ছিরিছাঁদ সব বদলে যাচ্ছে। অমন একটা ভাল পাত্র জোগাড় করে দিল রাণুদি, তাকেও কেমন যেন ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে কথা বলিস। আমার তো লজ্জা করে। আজ অনাদির কাছেও ভারী লজ্জা করেছে আমার। মনে হচ্ছিল ওর সামনে আমাকেও বুঝি তুই ব্যঙ্গ করছিস।'

'নাঃ তুমি আমায় ভাবিয়ে তুললে মা।' বুলা বলে।

বুলার মা বলে, 'তা ভাবো একটু তলিয়ে ভাবা দরকার। সর্বদা হাওয়ায় ভাসা চলে না। তুই তো চলে যাবি। আমাকে ওই অনাদির ভরসাতেই থাকতে হবে, তা ভেবে দেখেছিস?'

বুলা হঠাৎ খুব হেসে বলে ওঠে, 'ও মা, সে কি? তবে যে রাণুমাসি বললেন, তোমার জামাই তোমায় আর এই পচা গলিতে একা পড়ে থাকতে দেবে না! তোমার ভাল ব্যাবস্থা করে দেবে।'

বুলার মা আহত হয়। মেয়ের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে বলে, 'সেই ব্যবস্থা আমি নেব, এই তোর ধারণা?'

'বাঃ তোমার সবচেয়ে নিকটজন যদি—সেইতো সবচেয়ে নিকট-জন হবে তাই না?'

'আমার-ভাইয়েরাও আমার কম নিকটজন নয় বুলা, তারা যেটা পারেনি, সেটা আর কেউ পারবে এমন ভাবিস নি।'

বুলার মা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'যখন মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পেরেছি— তখন সকলের মাঝখানে গিয়েছি, এখন তো সে

উঁচু মাথা নেই—।'

বুলা বলে ওঠে, 'আচ্ছা মা, বাবা যদি অত বড় চাকুরে না হতেন, সামান্য একজন গরীব কেরানী হতেন, তাহলে কি বাবা মারা গেলে তোমার উঁচু মাথাটা হেঁট হয়ে যেত?'

মা মেয়ের এই বোকার মত কথায় একটু বিরক্ত হয়, বিরক্ত আর দুঃখের গলায় বলে, 'এমন আজে বাজে কথা বলিস তুই। তেমন অবস্থা হলে মাথাটা আর উঁচু থাকতো কখন, এ পাড়ার ওই সব গিন্নীদের মতই অবস্থা হতো।'

'ওঃ তাও তো বটে!' বুলা যেন এতক্ষণ পরে আসল কথাটা বুঝতে পারে। বলে, 'ওটা আমি খেয়াল করিনি। কিন্তু মা, খাবার তো একটু দেরী আছে? একটু ঘুমিয়ে নেব? দারুণ মাথা ধরছে। সারিডন আছে?'

বুলার শরীর ঘুমে ভেঙে আসছে, সেটা বুলার সিঁড়ি ওঠা দেখেই বোঝা গেল। আশ্চর্য বটে। ঘুমে শরীর ভেঙে আসছিল বুলার, অথচ দোতলায় উঠে গিয়ে বিছানায় পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চোখের ঘুম চলে গেল তার। বুলার মাথার মধ্যে অনেক কথা অনেক লোক অনেক আলো আর অনেক ঘরবাড়ি হুড়মুড়িয়ে ঢুকে এসে তোলপাড় শুরু করে দিল।

বুলা সেইগুলো ঠেলে সরাতে চেষ্টা করল. পারল না, বুলার যেন চারিদিকের সব বাতাস বন্ধ হয়ে গেল। বুলা উঠে পড়ল জল খেল, জানলাগুলো সব খুলে দিল, পাখাটা শেষ অবধি বাড়িয়ে দিল, তারপর বুলা আবার চেষ্টা করল ওই ভিড়গুলো দু'হাত দিয়ে ঠেলে ফেলে দিয়ে একটা ফাঁকা জমির কথা ভাবতে, কিন্তু বুলা ওই ভীড়ের মধ্যে অনবরত তার মা'র মুখটা দেখতে পেল।

চোখে আলো, মুখে দীপ্তি। বুলা মায়ের ওই মুখটা ঠেলে ফেলে দেবে কী করে? অথচ দুটোকে আলাদা করা যাচ্ছে না কিছুতেই।

ভীড়ের মধ্যেই মা। চেষ্টা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে শেষপর্যন্ত, বুলা ঘুমিয়েই পড়ল।

বুলার ঘুম ভাঙল মায়ের ডাকে। উদ্বিগ্ন গলা।—'তোর কি শরীর কিছু খারাপ হয়েছে বুলা? দু'বার ডেকে গেছি খাবার জন্যে উঠলি না, এখন এই বৃষ্টিতে ঘর ভেসে যাচ্ছে।'

বুলা উঠে দেখল বাইরে ঝমাঝম বৃষ্টি পড়ছে, বুলার শরীরটা জুড়িয়ে গেল। বুলা বলল, 'না না, শরীর ঠিক আছে। মাথাটা দেখছি এখন ছেড়েছে।'

বুলার মা'র আশঙ্কা অমূলক করে দিয়ে অনাদি সকাল বেলায়ই এল। বলল, 'আজ তাহলে কাজের লিস্টটা করে ফেলা যাক মাসিমা, আপনি বলুন আমি পরপর লিখে নিই!'

বুলার মা মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন, নিঃশ্বাস ফেলেন দুঃখেরও। এমন ভাল ছেলেটা, বুলা যে কেন অমন করে?

বুলার মা কাগজ পেন্সিল এগিয়ে দিলেন, বললেন, 'ঠিক বলেছ, কাজের লিস্ট থাকা ভাল আগে পরে হিসেবে।...কিন্তু তোমার আজ অফিস নেই বাবা?'

'একটু বেলায় যাব।' অনাদি গুছিয়ে বসে বলে, 'সব আগে ধরুন আপনার—'

বুলা এক পেয়ালা চা প্লেট একটু চিঁড়ে ভাজা নিয়ে এসে সামনে বসিয়ে দিয়ে হেসে বলে, 'আগে মরকধ্বজ খেয়ে গায়ে জোর করে নাও অনাদিদা, তারপর কোমর বেঁধে কাজে লেগো।'

অনাদি বলে, 'এখন আবার এসব কেন? এই তো চা খেয়ে আসছি।'

বুলার মা প্রমাদ গণে মেয়ের মুখের দিকে তাকায়। মেয়েকে বিশ্বাস নেই তার, হয়তো ফট্ করে বলে বসবে, 'মা তোমাকে মান্য ভক্তি করতে বলেছে অনাদিদা, তাই তাড়াতাড়ি চা আনলাম।' কি

ভাগ্যি বলল না সেটা। শুধু হেসে হেসে বলল, 'আহা দু'চারবার চা যেন খাও না তোমরা? চায়ের দোকানেই তো আড্ডা তোমাদের।'

অনাদি এবার মুখ তুলে বলে, 'আর কোনোদিন আমাকে চায়ের দোকানে ছাখ?'

'কি জানি বাবা, হরদম তো দেখতাম।'

'সেটা কবে? মানে শেষ কবে দেখেছ?'

'এই সেরেছে! সাল তারিখ বলতে হবে জানলে খাতায় টুকে রাখতাম। কিন্তু শেষটা কিন্তু আগে বোঝা যায় অনাদিদা? এই যে আমি তোমায় চা এনে দিলাম, এটা যে শেষ, তা কি তুমি এখন বুঝতে পারবে? আমার মরার আগে কি নিশ্চিত বলা যাবে?'

'ও আবার কী কথা বুলা?' বুলার মা রীতিমত রেগে গিয়ে বলে, 'কী আজে বাজে বকতে শুরু করলি? শেষ-টেষ ও কেমন কথা? শেষই বা হতে যাবে কেন? বালাই ষাট!'

বুলা হেসে হেসে বলে, 'তা অনাদিদা কী আর বড়লোকের দেউড়ি ডিঙিয়ে আমার কাছে চা খেতে যাবে গো মা? আর আমিও কিছু তোমার ওই ভাঙা রান্নাঘরে এসে মোটা পেয়ালায় চা ঢালতে আসব না। তাহলে?'

'বুলা পালা, মাসিমাকে কাজ করতে দে।' অনাদি বলে।

'আচ্ছা চললাম। কিন্তু আমারও যে কিছু কাজের কথা ছিল অনাদিদা।'

বুলার মা একটু অবাক হয়, বলে, 'তা তোর যদি কিছু কেনা-কাটার থাকে তো বল না, লিখে নিক।'

বুলা বলে, 'নাঃ কেনার কিছু নেই। আচ্ছা থাকগে...'

বুলা চলে গেলে বুলার মা বলে, 'চা-টা খেয়ে নাও বাবা। বিয়ের কথা হয়ে ইস্তক বুলার যেন মনের স্থিরতা নেই। আমাকে একা থাকতে হবে ভেবে আর কি।'

অনাদি বলে, 'হুঁ।'

'মেয়ে দেখাটা রাণুদির বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার ছুতোয় হয়ে গেছে। মেয়েকে টের পেতে দেওয়া হয়নি। কিন্তু পাকা দেখাটা তো আর হবে না? তাতে ঘটা চাই। হবে অবশ্য সেই রাণুদির বাড়ি থেকেই, তবু শোরগোল আছে।'

বুলার মা বলে, 'করতে অবশ্য আমাদের কিছুই হবে না, জামাই-বাবু করিৎকর্মা মানুষ। তা হলেও—তোমাকে একটু যেতে হবে বাবা মানে দেখবে আর কি। নেমন্তন্নীর মতই সেজে গুজে—'

এটা বুলার মা'র ইঙ্গিত। একটু যেন ফর্সা সাজসজ্জায় যায় অনাদি। অবিশ্যি রাণুদির বাড়িতে অনাদি একটা বিস্ময় প্রশ্নের মত। সকলেই বলবে, 'এ কেন? এ কে?' বুলার মা যে সেটা ভাবছিল না তা নয়। কিন্তু অনাদিকে না বলাটাও একটু চক্ষুলজ্জার ব্যাপার। ভাবতে তো পারে মাসিমা মেয়ে পাকা দেখার ঘটা করতে চলে গেলেন। আমায় কিছু বললেনও না।

কিন্তু ওঘর থেকে হঠাৎ বুলার হাস্য'বাল শোনা গেল, 'ও মা, কী পরে সেজে গুজে যাবে গো? বড়লোকের বাড়িতে যাবার পোশাক অনাদিদার আছে না কি?'

বুলার মা লজ্জায় মরে যায়। কেন যে এরকম করছে বুলা, তা বুঝে উঠতে পারছে না বেচারা। হতাশ চোখে তাকিয়ে অনাদিকেই বলে, 'দেখছ তো বাবা, আমার সঙ্গে কী রকম করছে? কী যে হয়েছে যেন ভূতে পেয়েছে।'

অনাদিও বুঝে উঠতে পারছে না বুলা এ রকম করছে কেন? ভাল বিয়ে হবার আহ্লাদে না কি? তাই কি সম্ভব? আস্তে বলে, 'ও সব ঠিক হয়ে যাবে। বলুন মাসিমা, কবে দরকার?'

মাসিমা বলেন।

কিন্তু ভারী দুঃখের ব্যাপার, খুব বেশী ইচ্ছে সত্ত্বেও অনাদির যাওয়া হবে না। ঠিক সেইদিনই ওর ভারী জরুরী একটা কাজ আছে অফিসে।

শাপে বর হল, বুঝলে অনাদিদা, বুলা এসে বলে, 'মা'রও বলা হল, তোমারও যেতে হল না। কারুরই প্রেসটিজ পাংচার হবার ভয় রইল না।'

অনাদি চলে যাবার আগে বুলা আবার কী জন্যে যেন দোতলা থেকে নেমে এল, বলল, 'ও মা, অনাদিদা তুমি এখনো বসে বসে বিয়ের খাটুনি খাটছিলে ?'

অনাদি সে কথার উত্তর না দিয়ে বলে, 'মাসিমাকে অমন জ্বালাচ্ছিস কেন বুলা ?'

বুলা গম্ভীরভাবে বলে, 'মা লাগিয়েছে বুঝি ?'

'ছিঃ! কাকে কি বলছিস ? লাগাতে হবে কেন, দেখতে পাচ্ছি না ?'

বুলা অন্যদিকে তাকিয়ে বলে, 'বেশীদিন আর জ্বালাব না বলে !'

'উনি এতে মনে কষ্ট পাচ্ছেন বুলা।'

বুলা সেই ভাবেই ঘাড় ফিরিয়ে রেখে বলে, 'কে কিসে কষ্ট পাবে তা সবাই দেখছে না কি সংসারে ?'

'দেখতে চেষ্টা করে।'

বাজে কথা বল না অনাদিদা। যে যার নিজের ইচ্ছে পূরণের তালে চলে।'

'তোর কথার মানে বোঝা দায়।' অনাদি ম্লান ভাবে বলে, 'এক এক সময় যেন হেঁয়ালি হয়ে উঠিস। আচ্ছা চললাম, বিকেলের দিকে আর একবার আসব কিছু জিনিসপত্র নিয়ে।

বুলা খুব গম্ভীর ভাবে বলে, 'অনেকদিন আগে একটা সিনেমা দেখেছিলাম, তার একটা দৃশ্য মনে পড়ে যাচ্ছে অনাদিদা। একটা চাষাভুষো লোক—খুব যত্ন করে একটা ছাগল পুষত, তার কাছে গ্রামের জমিদারবাবুর আদেশ এল ছাগলটা তাঁর মানৎ পূজোয় চাই। গ্রামে না কি অমন সুলক্ষণ-যুক্ত ছাগল আর নেই। জমিদারবাবুর হুকুম, লোকটা সেই ছাগলটাকে গাছের কচি কচি পাতাগুলো

খাইয়ে-টাইয়ে, নিজে বয়ে নিয়ে চলেছে বলিদানের জায়গায়। দৃশ্যটা মনে পড়ে যাচ্ছে। কী, ঘটে ঢুকল কিছু? না কি এও আর এক হেঁয়ালি মনে হচ্ছে?'

অনাদি আস্তে দেয়ালে হেলানো সাইকেলটা টেনে নিয়ে বলে, 'ঘটে ঢুকলে সেটা আরো হেঁয়ালি মনে হয় বুলা, ঢাকবার চেষ্টা না করাই ভাল।'

অনাদি চলে যায় সাইকেলটাকে ঠেলতে ঠেলতে। গলি থেকে তরতরিয়ে চলে যাবার ইচ্ছেটা যেন খুঁজে পায় না।

সকাল থেকে বুলার মা তাড়া লাগাচ্ছিল বুলাকে, চান করে নিতে, সাজ করে নিতে, বেলা দশটায় শুভক্ষণ, বাণুমাসির গাড়ি এসে পড়ল।

বুলা তখনো স্নান-টান করেনি। বুলার মা হাপসে বসে পড়ল, এখন কতক্ষণ গাড়ি বসিয়ে রাখব বুলা?'

বুলা বলল, 'ওদের তো দুটো তিনটে গাড়ি আছে মা।'

'আছে যেমন তেমনি তাদের কাজও আছে।' কোথায় বিয়ের আগে বুলার মা মেয়েকে কেবল আদর করবে, তা নয় অহরহ তার ওপর বিরক্ত হতে বাধ্য হচ্ছে। বুলার মা সেই বাধ্য হয়েই বলে, 'তুমিই বা এমন করছ কেন? মনে হচ্ছে তোমার যেন হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। তোমার ধরণ-ধারণ আমার ভাল লাগছে না বুলা! এ বিয়ে কি ভেঙে দিতে চাও?'

'ও মা, সে কি?' বুলা উঠে পড়ে। বলে, 'তোমার কত কষ্টে গড়ে তোলা সাধ, আমি চাইলেই অমনি ভেঙে যাবে? এই আমি চললাম, দু'মিনিটের মধ্যেই ফিটফাট হয়ে আসছি।'

বুলার মা বুলার বিছানাতেই বসে পড়ে দেয়ালে টাঙানো একটা ঝাপসা ছবির দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলে, 'বল, আমি ভুল করছি না ঠিক করছি? যা অসম্ভবের অসম্ভব তাকে আমি সম্ভব করতে

চাইব নাকি ? আমায় তাই অবোধ সাজতে হচ্ছে নিষ্ঠুর হতে হচ্ছে। তুমি যদি পষ্ট করে বলে দিতে আমি বুঝে নিতাম কী করব।'

কিন্তু ছবি আর কবে কথা বলেছে ?

বুলা আর বুলার মাকে নিয়ে গাড়ি যখন রাণুদির বাড়িতে পৌঁছল রাণুদি তখন মুখ থমথমে করে বেড়াচ্ছেন।

বুলার মা তাড়াতাড়ি একটা অজুহাত দিচ্ছিল দেরীর জন্যে, রাণুদি বললেন, 'থাক আন্নু ওসব কথা, ঘরে এস, তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

বুলার মা ভয়ে মুখ শাদা করে চলল পিছু পিছু। নিজের শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে যে সংবাদটি দিলেন রাণুদি, বুলার মা'র হাত পা হিম হয়ে গেল।

পাত্রপক্ষ রাণুদির কাছে প্রশ্ন করে পাঠিয়েছেন, বুলাদের পাড়ায় বুলাদের কোনো শত্রু আছে কিনা! বুলার মা তেমন কাউকে জানেন কিনা। যে শত্রু বিয়েটা ভেঙে দেবার তালে মেয়ের নামে কুৎসা রটাতে পারে ?

বুলার মা আকাশ থেকে পড়ে চুপ করে বসে থাকে।

'তুই আর বুঝবি কী করে ? তুই তো চিরকেলে বোকা—'

রাণুদি বলেন, 'আছে নিশ্চয়। ওখানে উড়ো চিঠি দিয়েছে মেয়ের রীত-চরিত্র ভাল নয়, বাড়িতে পাড়ার যত বদ ছেলেদের যাতায়াত আছে, একজন তো ও বাড়িতে পড়েই থাকে। পাড়ার সকলে ধরে নিয়েছিল ওর সঙ্গেই বিয়ে হবে, হঠাৎ এই রাজপুত্র জুটে গেল। কিন্তু এঁরা সরল ভদ্রলোক, এঁরা তো এসব ভাবতেই পারবেন না তাই অবহিত করিয়ে দেওয়া। এখন যথাকর্তব্য তাঁরা বুঝুন।

সবকিছু বিশদ ব্যাখ্যা করে রাণুদি বলেন, 'ওরা অবিশ্যি লোক অতি ভদ্র। বলেছে আমরা এসব বিশ্বাস করছি না, যাচ্ছি পাকা দেখা করতে। তবে আজ থেকে মেয়ের আর ও-বাসায় থাকা চলবে না। এখানে মাসির বাড়িতে থাকুক। এই তাঁদের নির্দেশ।'

বুলা নির্জনে মাকে বলল, 'এখন থেকেই ওদের আদেশ বলবৎ হবে মা?'

বুলার মা বলল, 'আমায় আর জ্বালাসনে বুলা। যে আমার এই শত্রুতা করেছে তাকে আমি দেখে নেব। মানুষকে বিশ্বাস নেই। কার কি স্বরূপ সে শুধু সময়কালে ধরা পড়ে।'

বুলা একবার কেঁপে উঠল। বুলা মাকে এমন ভয়ঙ্কর মূর্তিতে দেখেনি কখনো।

এই সময় দশটা বাজল, শুভক্ষণ পড়ল, বুলার ভাবী শ্বশুরবাড়ির লোকেরা হীরের নেকলেস দিয়ে আশীর্বাদ করে গেলেন, এবং আর একবার বলে গেলেন, মেয়েকে যেন ওই ক্লেদাক্ত জায়গায় আর না পাঠানো হয়।

অতএব মেয়েকে রেখেই বিদায় নিতে হল বুলুর মাকে।

রকের বাসিন্দারা যথারীতি রক আলো করে বসে ছিল, দেখতে পেল অনাদি নামের তাদের দলছুট বন্ধুটা সাইকেলটাকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চলেছে।

বিজয় চেঁচিয়ে ডাকল, 'সাইকেলটাকে হাঁটাচ্ছিস কেন রে অনাদি? পাংচার হয়ে গেছে?'

অনাদি কথা বলল না। বিজয় আবার বলল, 'তুই তো বাবা আমাদের মতন বেকার নোস, তুই কেন এমন অসময় রাস্তায়?'

'আজ যাইনি।' বলে হঠাৎ সাইকেলটাতে উঠে পড়ে সাঁ করে চলে গেল অনাদি। যেন বন্ধুদের কবল থেকে পালাল।

অজিত বলল, 'চেহারা হয়েছে দেখেছিস? যেন একের নম্বর লক্ষ্মীছাড়া।'

দুলাল চুক চুক করে বলে ওঠে, 'আহা, হবে না? হৃদয় যে একেবারে বিদীর্ণ হয়ে গেছে প্রভুর।'

'ঠাট্টা নয় রে, ছোঁড়াকে দেখে মায়া হবেই। আহা, কত মাথার

ঘাম পায়ে ফেলে একখানি নন্দন কাননের অমৃতফল প্রায় জোগাড় ক'রে ফেলেছিল—কোথা থেকে উড়ো চিল উড়ে এসে সেটি ছোঁ মেরে দিয়ে গেল গো।'

'যা বলেছিস মাইরী। তুলনা একখানা দিলি বটে। চিলের ছোঁ'ই বটে। আমরা কোথায় দিন গুণছি, কবে শুভ কাজটি হয়, কবে আমাদের একটা ভোজ হয়, ও মা! একেবারে সব খতম।'

অজিত একটু গম্ভীর হয়ে বলে, 'ওর জন্যে আমরা কিছু করতে পারি না?'

'আমরা কী করব?'

'কী করব, কী করতে পারি, সেটাই তো পরামর্শ করতে হবে।'

'ও আমাদের আর পোঁছে না।'

'নাইবা পুঁছল! তবু বন্ধু তো? এক সময় হরিহর একাত্মা ছিল তো? শালার মুখের দিকে তাকিয়ে বুক ফেটে যাচ্ছে।'

'হতভাগা যে একবারের জন্যে আমাদের সাহায্য চাইতে এল না। তা এলে ওই শঙ্খচিলের আর ওর মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে যাওয়ার সাহস হতো না।'

'বলবে না, সেদিকে যে তেজে মটমট। ভেবেছিল মাদারের তোয়াজ করে করে আর কন্যের খিদমদগারি খেটে রাজকন্যেটিকে বাগিয়ে নেবে। অত সোজা নয়। যতই হোক, মাদার জজের মেয়ে। আর পরিবারও হয়েছিল একখানা কেষ্ট বিষ্টুর। হাড়ির হাল করে থেকে থেকে এখন কেমন ধুকড়ির মধ্যে থেকে কাঁড়া চালটি বের করল। একেবারে রাজপুত্তুর জুটিয়ে ফেলল একখানা।'

দুলাল হাতের আঙুলগুলো মটকাতে মটকাতে বলে, 'আমাদের ফ্রেণ্ডের প্রতি দিদিমনির কিন্তু একটু নেক্‌নজর ছিল। বুকে লাগবে।'

'সেরে যাবে। ভানলোপিলোর গদি আঁটা মটর গাড়িতে চাপলেই ও-সব উপে যাবে গুরু। ভাবিসনে ওর জন্যে।'

'দূর, ওর জন্যে কে ভাবছে? ভাবছি আমাদের ফ্রেণ্ডটার জন্যে।

ও শালা যদি একবার আমাদের শরণাপন্ন হতো তাহলে ওর প্রেয়সীকে হু করেই ওর পকেটে পুরে দিতে পারতাম। তা তো করল না, শালা আমাদের সঙ্গেই ডাঁট্।'

'এখন ডাঁট ভাত হয়ে গেল গুরু! যাদু একেবারে ঝুলে পড়েছেন।'

দুলালের কথায় বিরক্ত হয় অজিত। কড়া গলায় বলে, 'তবু মনে রাখিস দুলাল, ও আমাদের বন্ধু, ওর আশার জিনিস অন্যে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে, এ হতে দেব না।' তাস ভাঁজানো রেখে ওরা মতলব ভাঁজতে বসে।

বুলার মা শান্ত, কিন্তু বুলার মা মাটির পুতুল নয়। বুলার মা'র ভিতরে আগুন মজুৎ আছে। সেই আগুনে জ্বলতে জ্বলতে বাড়ি ফিরল বুলার মা। রাণুদির ড্রাইভারই পৌঁছে দিয়ে গেল। মেয়ের বিয়ে দিয়ে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দিতে হবে, তা জানে বুলার মা, তবু আজই একা বাড়িতে ফিরে আসতে ওর চোখ দিয়ে জল এসে গেল, সেটা টগবগে ফুটন্ত।

রাণুদির কাছে মুখ পুড়েছে, নতুন কুটুমের কাছে মাথাটা ধুলোয় লুটিয়েছে। যতই ওরা ভদ্রতা করে বলুক 'বিশ্বাস করেনি' তবু একে-বারে নির্মল মনোভাবটি কি থাকবে?

রাণুদি যে আরো জ্ঞান দিয়েছে বুলার মাকে। বুলার মা যে শ্বশুর মারা যাওয়ার পর দাদাদের দুর্গে আশ্রয় না নিয়ে একা ওই বিস্থিরি পাড়ায় সুন্দরী যুবতী মেয়ে নিয়ে বসবাস করেছে, এটা দৃষ্টি-কটু, আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে যে প্রায় বিচ্ছিন্ন, এটা সন্দেহজনক। অতএব ওরা যদি বিয়ে ভেঙে দিতে চাইত, দোষ দেওয়া যেত না। ওরা মহানুভব বলেই—

জ্বলতে জ্বলতে বাড়ি এল বুলার মা। এ-কাজ অনাদি ছাড়া আর কারুর নয়। ওরই স্বার্থ। ভেবেছিল হয়তো সত্যিই কি আর

এক কথায় বিয়ে হবে? যখন দেখল হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে, তখন এই কুৎসিত কাণ্ডটি করে বসল। আচ্ছা, বুলার মা-ও দেখে নিতে জানে।

ভয়ানক একটা বিশ্বাসভঙ্গে ক্ষেপেই যায় মানুষ। বুলার মা ও ক্ষেপে গেছে। তাছাড়া বুলার কুমারী জীবনের শেষ ক'টা দিন বুলার মা তাকে বুকের কোটরে ভরে রাখতে চেয়েছিল, অকারণে তাকে ফেলে রেখে চলে আসতে হল। বাণুদি অবশ্য বলেছে, 'একলা আবার থাকবি কি তুই, আজ গুছিয়ে গাছিয়ে বাড়ি বন্ধ করে কালই চলে আয়। আর তো মাত্র দশটা দিন। মেয়ের কাছে থাকবি না?' কিন্তু সেই কাছে থাকার কি মূল্য? পরের বাড়িতে?

বুলা যে পরে একদিন হঠাৎ বলেছিল, 'আচ্ছা মা, দাদু থাকতে তুমি কত কত দিন মোচার ঘণ্টা করতে, আর কর না কেন?' একদিন বলেছিল, 'আচ্ছা মা, রোজ রোজ রাত্তিরে রুটি খাওয়ার কোনো মানে আছে? একদিন তালের বড়া খেয়ে থাকা যায় না?' সে কথাগুলো এখন ছুরির ফলার মত বিঁধছে না? বাড়িতে থাকলে তো—

বুলার মা বাঘিনীর মত ফুলছিল আর বুলার মা আসামীকে দেখা মাত্র বাঘিনীর মতই ঝাঁপিয়ে পড়ল।

'ভালমানুষের ছদ্মবেশে তুমি এই করলে অনাদি? এই তোমার স্বরূপ? এই ক্ষতিটা করলে তুমি আমার? কুটুমের কাছে মুখ পোড়ালে? ছি ছি? অথচ আমি তোমায় ছেলের মত ভালবেসেছি, বিশ্বাস করেছি। ভাল প্রতিদান দিলে তার। তবে তোমার কিছু লাভ হল না তা জেনো। শুধু আমারই সমূহ ক্ষতি করলে—'

অনাদি চারিদিকে তাকিয়ে দেখে। অনাদি একটা গভীর শূন্যতা অনুভব করে। বুলা সামনে না থাকলেও, চোখের আড়ালে থাকলেও বাড়িতে ওর উপস্থিতিটাই অলক্ষ্যে ভরাট করে রাখে, এই গভীর শূন্যতাটা যেন বলে দিচ্ছে বুলা নেই। বুলা চলে গেছে।

কিছুদিন থেকে বুলার মধ্যে কিসের যেন দ্বন্দ্ব চলছিল, বুলা কি

সেই দ্বন্দ্বে বিভ্রান্ত হয়ে চলে গেছে? আর বুলার মা অনাদিকে সন্দেহ করছেন?

অনাদি বসে পড়ে শুকনো গলায় বলে, 'কী হয়েছে মাসিমা, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

বুলার মা এই অভিনয়ে ভোলে না, বুলার মা আজ তীব্র হয়। বুলার মা বলে, 'তুমি ঠিকই বুঝতে পারছ বাবা, শুধু আমিই এতদিন তোমায় বুঝতে পারিনি। ভেবেছি হলই বা গরীব, সৎ সরল ভদ্র। অথচ তুমি ভেতরে ভেতরে আমার সর্বনাশের তাল করছিলে। কিন্তু এটা জেনো অনাদি, পায়ে মাথায় কখনো এক হয় না। বিয়ে যদি ওরা ভেঙেও দিত, তোমার হাতে মেয়ে দিতে যেতাম না আমি। বরং মেয়েকে গঙ্গায় ফেলে দিতাম।'

'এসব কী বলছেন আপনি মাসিমা?' অনাদি উঠে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত গলায় বলে, 'মাথামুণ্ডুহীন কী সব বলছেন? কোথায় গেছে বুলা?'

'তোমার কোনো কথার উত্তর দেব না আমি।' বুলার মা কঠিন গলায় বলে, 'অসময়ে তুমি—যে উদ্দেশ্যেই হোক আমার অনেক উপকার করেছ, তার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ। এখন তুমি যেতে পারো। জেনে রেখ, এ দরজা তোমার কাছে চিরদিনের জন্যে বন্ধ হয়ে গেল।'

অনাদি যদি ভদ্র হতো তাহলে অনাদি এইদণ্ডে বেরিয়ে যেত, হয়তো দু'কথা শুনিয়েই দিয়ে যেত। কিন্তু অনাদি মিস্ত্রীর ছেলে, অনাদি ভদ্র পদবাচ্য নয়। তাই এত অপমানেও স্থির থেকে বলে, 'পায়ে মাথায় এক হয় না তা আমিও জানি মাসিমা। তবু ব্যাপারটা কী হয়েছে, আমার জানতেই হবে।'

'আমি তোমায় বলতে বাধ্য নই।'

অনাদি হঠাৎ কড়া গলায় চেঁচিয়ে ওঠে, 'একেবারেই নন তা আপনি বলতে পারেন না মাসিমা। বড়লোক হলেই যে গরীবকে যা ইচ্ছে বলা যায় এ-ধারণা আপনাদের ভুল। আপনাকে বলতেই

হবে হঠাৎ কোন্ ঘটনার ফলে আপনি আমায় হঠাৎ চাবুক লাগাতে শুরু করলেন। বলুন। বলতেই হবে।'

বুলার মা ভয় পেয়ে যায়। বুলার মা তাকিয়ে দেখে সে একা। এই গোঁয়ার ছেলেটা কী করতে পারে বলা যায় না। বুলার মা একটু থেমে বলে, বুলার শ্বশুরবাড়িতে তুমি বুলার নামে বদনাম দিয়ে চিঠি দাওনি? বলনি একটা ছেলের সঙ্গে বুলার—'

অনাদি আর একবার বসে পড়ে। ভাঙা গলায় শুধু উচ্চারণ করে, 'মাসিমা!'

বুলার মা এই গলায় থতমত খায়। বুলার মা এখন কী বলবে ভেবে পায় না। অনাদি আবার উঠে পড়ে বলে, 'আপনি যখন এতদূর ভাবতে পেরেছেন, তখন আরো যা ইচ্ছে ভাবুন, কিছু এসে যাবে না আমার। আপনাকে শুধু এইটুকুই বলে যাচ্ছি, বুলাকে যদি আমি নিতে চাইতাম, অনেকদিন আগেই নিতে পারতাম। আপনি ঠেকাতে পারতেন না। বুলা আমার হাতের মুঠোয় ছিল। আমি সে সুযোগ নিইনি, আমি বুলাকে বাঁচিয়ে এসেছি। আমিও ভেবে এসেছি পায়ে মাথায় এক হয় না।'

অনাদি বেরিয়ে যায়।

বুলায় মা বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকে। অনাদিকে সে বোকা ভেবে এসেছে এতদিন? বুলার মা রাগের মাথায় কি ভয়ানক একটা ভুলই করে বসল? এত ধৈর্যহারা হল কেন বুলার মা? কিন্তু কে তবে?

কে, সে-কথা অনাদির বুঝতে দেরী হয়নি। অনাদি দেখল একা অজিত বসে। অনাদি ওর জামার কলার চেপে ধরে বলে উঠল, 'এই রাস্কেল, কী চিঠি লিখেছিস বুলার শ্বশুরবাড়িতে?'

'চিঠি? চিঠি আবার কিসের?' অজিত আর্তনাদ করে, ছাড় বাবা বলি, 'চিঠিফিটি জানি না। আমরা ঠিক করেছিলাম তুই

আমাদের বন্ধু, তোর হয়ে কিছু করব। বুলাকে হারিয়ে তুই মনমরা হয়ে—'

'শাট্ আপ। ভদ্রভাবে কথা বল।'

'আরে বাবা তাই তো বলছি, আর কত ভদ্রভাবে বলব? তুই মুখ শুকিয়ে বেড়াস তাই ভাবলাম তোর মুখের গ্রাস অন্যে কেড়ে নিয়ে যাবে? আমরা সেটা ফিরিয়ে আনি। ঠিক করলাম—ওর মা তো যখন বাড়ি থেকে হাওয়া হয়ে যাচ্ছে, ওই হাওয়ার সুযোগে একদিন আমরা পঞ্চপাণ্ডব গিয়ে ওকে 'মা'র অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে' বলে ভুলিয়ে বার করে এনে তোর জন্যে কোথাও মজুৎ রেখে দেব—'

'অজিত, তোর যদি কোনো ঈশ্বর থাকে তো তার নাম কর নয় তো শয়তানের। আমি তোকে খুন করব।'

অজিত গলাটা ওর হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, 'ভাল রে ভাল, যার জন্যে করি চুরি সেই বলে চোর। যা শালা করলাম তা আর হল কই? দুদু মাদার কেমন করে কে জানে আমাদের মতলব ধরে ফেলে মেয়েটাকে যে কোথায় পাচার করে দিল। বিয়ে তো শুনেছিলাম আরো ক'দিন পরে—এক্ষুনি কি বরের বাড়িতে—?'

'অজিত, ঈশ্বরের নাম করছিস?'

অজিত হতাশভাবে বলে, 'ওসবের পাট নেই রে অনাদি। মারবি তো মেরে ফেল। জাঙিয়া পরা বেলা থেকে তোর সঙ্গে খেলেছি—'

অনাদি ওর ঘাড়টা ছেড়ে দিয়ে বলে, 'তবে চিঠিটা কে লিখল?'

'জানি না ভাই।'

'কিন্তু এরকম একটা চিঠি গেছে সেখানে। তার মানেটা বুঝতে পারছিস? বন্যার জীবনটার চিরদিনের মত একটা ফাটল হয়ে গেল। ওর স্বামী হয়তো ওকে—নাঃ, এটা আমার বার করতেই হবে। কে লিখেছে? কে লিখতে পারে?'

অনাদি চলে গেল।

—অজিত কোম্পানী অবাক হয়ে বলে,—'আচ্ছা ব্যাপারটা কী

হলো মাইরী বলত? কে করল কাজটা?

বিজয় কুটিল হাসি হেসে বলে,—'আমি বুঝে ফেলেছি ব্যাপারটা কী? কে করেছে কাজটা।'

—অজিত উত্তেজিত হয়ে বলে,—'বুঝে ফেলেছিস? দেতো শালার নামটা 'ওপন' করে, চাকু চালিয়ে শালার পাঁজরাটা 'ওপোন' করে দিই।'

বিজয় বলে,—'এতো চটপট কি বলা যায় চাঁদু?'

বিজয় উপস্থিত সকলের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকায়। এদের মধ্যেই কেউ তাহলে। বিজয় সামনা-সামনি নাম প্রকাশ করতে ভয় খাচ্ছে।

তবু আস্ফালন করে বলে,—'বলে ফেল মাণিক, নির্ভয়ে বলে ফেল। একটা এস্পার ওস্পার হয়ে যাক। আমরা রকবাজ হতে পারি, নীচ নই কেউ, এই ধারণা ছিল, ধারণাটা পাল্টাতে হতো তা' হলে।'

বিজয় বলে, 'আমরা ছোটলোক মুখ্যু, আমাদের দ্বারা কী আর এতো বুদ্ধিমানের মতন কাজ হয় ব্রাদার? নাটের গুরু হচ্ছেন ভদ্দর। আমাদের কুকুর শ্যালের মতন ঘেন্না করেন।'

তুলাল চমকে উঠে বলে 'মাইরী? ঠিক বলছিস?'

'এর আর বেঠিকের কী আছে বাবা! তুইয়ে তুইয়ে চার, এ আমাদের মতন রামমুখ্যুতেও বোঝে।'

অজিত কপাল কুঁচকে বলে, 'তার মানে? তুই বলতে চাস কী?'

তুলাল এবার মিটিমিটি হেসে বলে, 'যা সত্যি তাই বলতে চাইছে বিজয়। তা' নইলে অত তড়পে যায়?'

অজিত তুলালের কাঁধটা খামচে ধরে বলে,—'তার মানে তুই বলতে চাইছিস নাটের গুরু অনাদি নিজেই।'

'এইতো ব্রাদার। তুমিতো বোঝ সবই, শুধু যা একটু লেটে বোঝ।'

অজিত গম্ভীরভাবে বলে,—'আজেবাজে কথা বলিস্‌নি বিজয় অনাদি অত ছোটলোক নয়।'

'শালুক চিনেছে গোপালঠাকুর। অনাদি তোকে এক হাটে বেচে আর এক হাটে কিনতে পারে। দেখছিলি না এতো দিন ধরে? কীভাবে ধীরে ধীরে চার ফেলে মাছকে বঁড়শির আগায় গিঁথে তুলছিল।'

দুলাল হ্যা হ্যা করে হেসে বলে, 'তা যা বলেছিস মাইরী গিঁথে খেলাচ্ছিল, মনে করেছিল রুইকে আরো খাল করে আনি। যাতে সুতো ছিঁড়ে না পালায়। হঠাৎ দেখল জালে ঢিল পড়ল' তাই—।'

অজিত গুম্‌ হয়ে বলে, 'আমি বিশ্বাস করিনা অনাদিকে দিয়ে এতো ইতর কাজ হতে পারে।'

'তুমি বিশ্বাস কর আর নাই কর চাঁদু, স্বয়ং যুধিষ্ঠির সাহেব স্বার্থ বুদ্ধির বলে একবার অশ্বত্থামা 'হত' করেছিল।

যুক্তি অকাট্য।

অজিত নিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'অথচ আমরা ওর জন্যে কত মাথা খাটিয়ে প্ল্যান করছিলাম—'

'আমাদের ও পোঁছে? আমাদের পিত্যেস করে? বরং আমাদের বেচো কেষ্টোর মতন ঘেন্না করে। আমাদের দেওয়া উপকার নিতে ওর দায় পড়েছে।'

'হুঁ।'

অজিত গুম হয়ে বসে থাকে।

দুলাল বিজয় খ্যাঁদা নীলমণি, তাস পেড়ে ভাঁজতে ভাঁজতে বলে, 'প্রভু—যেমন ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে গেছলেন, তেমনি মুখে কাঁটার ছড় লাগলো। ঘাস যে কাঁটা ঘাস তা আর ভাবেন নি প্রভু। এ এই হলো সাপ মরল না, লাঠি ভাঙলো।'

'বিয়েটা বন্ধ হবে না বলছিস?'

'কই আর হচ্ছে? মাদার তো কন্যেকে কোথায় পাচার করে এসে একা বাড়ি ফিরল।'

'আহাহা চুকচুক্। গুরু আর দুচারটে দিন দেখতে পেতো, পেলো না।'

তার মানে একুল ওকুল দুকুল খোওয়ালো।

রকের আড্ডায় অনাদি সম্পর্কে রায় বেরিয়ে গেল, 'আমরাই ওকে বয়কট করব।'

শুধু অজিতই কোনো কথা বলল না, তদবধি গুম হয়েই রইল।

অনাদি তাকে খুন করতে উদ্যত হয়েছিল।

এতো বড়ো অভিনেতা হয়ে উঠেছে অনাদিটা? বিশ্বাস করা যাচ্ছে না যেন। অথচ এরা জোর দিয়ে ওই কথাই বলছে।

কিন্তু অনাদির তখনকার সেই চেহারা?

সে কখনো অভিনয় হতে পারে?'

তবে?

তবে কে লিখেছে সে চিঠি?

কে লিখতে পারে?

এ-কথাটা বুলুর মাও ভাবছিল, কে লিখেছে, কে লিখতে পারে? যদি অনাদি না হয়? পাড়ার অন্য কেউ? নিছক শত্রুতা সাধতে? মেয়ের ভাল বিয়ে হচ্ছে শুনে—কিন্তু এমন শত্রু কে আছে আমার?

কিন্তু বুলার মা কি স্বপ্নেও ভাবতে পারত সেই শত্রু ছিল তার কোলের মধ্যে। তার বকের পাঁজরের নীচে।

বুলার মার এই অবস্থার মাঝখানে, বুলার মার বড় দাদা এলেন।

সুদামঘোষ লেন-এর এই পচা-গলিতে যাঁর আবির্ভাব অঘটনের কাছাকাছি।

তা' বলে বুলার মার দাদারা এমন হৃদয়হীন নয় যে বোনকে ভুলে গেছে।

গলিটা বিচ্ছিরী বলে নিজেরা আসতে পারে না, গাড়ি পাঠাতো। সে গাড়ি কেবলই খালি ফিরে যেত বলে গাড়ি পাঠানো বন্ধ করেছিল দাদারা, তবু যোগাযোগ রেখেছিল।

চাকর পাঠাত। পুরণো যারা।

উপলক্ষে অনুপলক্ষে এটা সেটা দিয়ে তার সঙ্গে চিঠি দিয়ে। ফল মিস্টি, ঘরে তৈরী খাবার। তা' বলার মা আবার এমন চক্ষু-লজ্জাহীন যে বলে, 'এতো কেন এনেছিস মধু, এতো কে খাবে? আমার শরীর ভাল নয় জানিস তো। আর আনিস না বাবা এতো।'

ক্রমশঃ ওটাও কমেছিল, তবু ছিল।

তবে বুলার মার যাওয়া আসা ছিল না।

কদিন আগে বুলার মা বড়মুখ করে দাদা-বৌদিকে মেয়ের পাকা-দেখার খবর জানিয়ে নেমন্তন্ন করতে গিয়েছিল।

বুলার মা যেন আবার পূর্ব প্রতিষ্ঠায় ফিরে এসেছিল।

—সেদিন ভাজেদের সঙ্গে অনেক হাসি গল্প করে এসেছে বুলার মা। রাণুদের প্রশংসাও করে এসেছে শতমুখে।

ভাজেরাও রাণুর ভাগ্নের সঙ্গে মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করে ফেলেছে শুনে ননদকে আবার আগের মত সমীহ দৃষ্টিতে দেখেছে। ওদের অবস্থা তো কারুর অবিদিত নয়। শুধু টাকার কুমীর।

মেজভাজ বুলার মার স্বাস্থ্য দেখে হা-হুতোশ করেছে, এবং মেয়ের বিয়ের পর বুলার মা যেন দু'চারদিন ভাইয়ের বাড়িতে থেকে স্বাস্থ্যটা একটু ফিরিয়ে নিয়ে যায়, এ নিয়ে সানবন্ধ অনুরোধ জানিয়েছে।

দুই বৌদি যে দুটো রান্নাঘর করেছে, সেটা বুলার মা এখন গিয়ে জানতে পেরেছিল।

বুলার মার বড়ভাজ আবার আরো উঁচুদরের কথা বলেছে।

বলেছে, 'আর তো তোমায় ওই গলির বাড়িতে একা পড়ে থাকতে দেওয়া হবে না ঠাকুরঝি। মেয়ে শ্বশুরবাড়িতে পাঠিয়ে দিলে তোমার সংসারটাই বা কী? এখানে থাকবে।'

বুলার মা হাস্যবদনে এসব প্রস্তাব শুনেছে।

শুধু সেদিন বড়দা ছিল না বাড়িতে, কী কাজে দিল্লী গিয়েছিল।

আজ দাদাকে ঢুকতে দেখে আশ্চর্য্য হলেও মনে করল সেদিন দেখা হয়নি বলেই বোধহয় দাদা—

বুলার মার দাদা কিন্তু সেদিনের কথার জের তুলে কথা শুরু করল না, বাড়িতে ঢুকেই বলে উঠল, বেশীক্ষণ বসবনা রে একটা জরুরি কথার জন্যে এসেছি—'

বুলার মার বুকের মধ্যে হাতুড়ির ঘা পড়ে।

আর কিছু নয়, সেই কথা?

নিশ্চয় রাণুদি ফোনে ফোনে যোগাযোগ করে সবাইয়ের কাছে খবরটা পৌঁছে দিয়েছে।

না হলে দাদা কেন?

বুলার মা নিজেকে শক্ত করতে চেষ্টা করে।

বুলার মা ওর দাদার অনুক্ত কথাগুলোরই উত্তর ঠিক করতে থাকে।

দাদা যখন এই বলবে, বুলার মা এই উত্তর দেবে।

বুলার মার দাদা কিন্তু বোনের এই রণসজ্জাটিকে আদৌ বুঝতে পারল না, বরং নিজেই সে বারবার বলতে লাগল কথাটা মন দিয়ে শুনবি, গোড়া থেকেই 'না না' করিসনি।

'বাঃ তুমি কী বলবে, আমি জানি?'

'নাই বা জানলি, শুধু এইটুকু জেনে রাখিস তোর ভাল ছাড়া মন্দ কিছু করব না।'

'আচ্ছা জানলাম।'

বুলার মা চেষ্টা করে একটু হাসে।

বুলার মার দাদা বলেন, 'বলতে এসেছি রাণুর বাড়ির কাছে ইস্কুল বাড়ি ভাড়া করে মেয়ের বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছিস, মেয়ের তো একটা মামার বাড়ি আছে, সে বাড়ি থেকে বিয়ে হতে পারে না?'

বুলার মার বহুদিন আগের একটা কথা মনে পড়ে যায়, বুলা আর বুলার মা বাদে একটা আলপিনও রাখবার জায়গা ছিল না সেই ছবির মত বাড়িতে।

তবু বুলার মা সে কথার ধার দিয়ে গেল না।

কারণ বুলার মা ভদ্র সভ্য।

তাছাড়া বুলার মা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল, দাদা আর কিছু কথা তুললো না দেখে।

তার মানে রাণুদি কিছু বলেনি।

রাণুদিকে মনে মনে প্রণাম করল বুলার মা।

তারপর আস্তে বলল, 'আমার জীবনে তো এই একটাই কাজ, খোলামেলা জায়গায় করবার ইচ্ছেতেই—'

দাদা জোর দিয়ে বলে, 'সে ব্যবস্থা একরকম হয়েই যাবে। বাড়ির পাশে নন্দীদের যে জমিটা পড়ে আছে, তাতে প্যাণ্ডেল বেঁধে —সে জমিটা বিরাট, ওতেই তোর সব হবে। আর আজকালতো ওটাই ফ্যাসান হয়েছে। প্যাণ্ডেলের এধারে সম্প্রদানসভা, ওধারে খাওয়ার টেবিল, মাঝখানে লোকজন বসা, একেবারে সিনেমার ছবির মতো—'

বুলার মা অবাক না হয়ে পারে না।

দাদার এই আগ্রহের মূল উৎসটা কী ভেবে পায় না।

ভগবানের মার খেয়ে বুলার মা স্তিমিত শান্ত একটা জীবনছন্দের মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত রেখেছিল, তার মাঝখানে এলো একটা উৎসাহের জোয়ার।

বুলার মা সেই জোয়াড়ে ভেসে ফুলে কেঁপে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল, হঠাৎ তার ওপরে এলো মানুষের মার।

বুলার মা সেই মার খেয়ে মানুষ জাতটার ওপরই সন্দেহ পরায়ণ হয়ে উঠেছে। তাই দাদার এই সহৃদয় আগ্রহের মধ্যে সে অভিসন্ধি খুঁজছে, কারণ খুঁজছে।

তবে কি ওদিকে বিয়েটা ভেঙেই পড়ে যাবে?

দাদা সেটা টের পেয়ে মহানুভবতা দেখাতে এসেছে?

সাপও মরবে লাঠিও ভাঙবেনা।

ভেবে নিজে নিজেই লজ্জিত হলো বুলার মা।

ছি ছি কতো নিচে এসে গেছে সে।

আস্তে একটু হেসে বলল, 'তার মানে সব দায় তোমার ঘাড়ে চাপানো।'

দাদা গম্ভীর গলায় বললো, 'সব দায় তো আমার ঘাড়েই পড়বার কথা ছিল খুকু, তুই যে ভয়ে নিজেই বয়ে চলেছিস। এখন এসময় অন্তত:—'

দাদা একটু সোজা হয়ে বসে বলে, 'লোকের কাছে মুখ দেখাতে দে। লোকে কি বলবে আমাদের যদি আমরা থাকতে তুই রাণুর আশ্রয়ে মেয়ের বিয়ে দিতে যাস।...তোর জামাইয়ের এক খুড়তুতো ভাই আছে সে ও সুপাত্র। তোর বৌদি বলছিল, আমাদের মাটির সঙ্গে যদি লাগিয়ে দেওয়া যায়। তা' গোড়াতেই যদি ওদের আমাদের প্রতি অশ্রদ্ধা আসে, যদি মনে করে লোকটা চামার, ছোটলোক, বাপমরা ভাগ্নীটার বিয়েতেও একটু সহায়তা করল না—'

বুলার মার অঙ্ক মিলে যায়।

বুলার মা কারণ খুঁজে পায়, উৎস খুঁজে পায়।

বুলার মা তখন নিজের দিকটাও দেখে।

অনাদির ভরসা করছিলাম, সে ভরসা তো গেল। তা'হলে দাদার প্রস্তাবেই রাজী হওয়া ভাল।

বুলার মা তখন নরম হয়ে বলে, 'আচ্ছা দাদা তোমরা যা ভাল বুঝবে।'

দাদা উঠে পড়ে।

মনে হয় যেন একটা কার্যসিদ্ধির উল্লাসে উল্লসিত হয়।

মানুষ পরিস্থিতির দাস বৈকি।

তা'নইলে এতবড় একটা দায় ঘাড়ে নিয়েও বুলার মামার এমন উল্লাস কেন?

বুলার যদি একটা শুধু কেরানীর বাড়িতে বিয়ে হতো? বুলার মামা কি মনে করত, বাপমরা ভাগ্নীর বিয়েতে তার কোনো দায় ছিল?

অথচ নির্বোধ বুলা বলে কিনা টাকাটাই কি পৃথিবীতে সব থেকে বড় জিনিস মা?'

বড়ো তবে কি?

দাদা চলে যাবার পরও ভাবনায় ডুবে বসে থাকে বুলার মা।

আজ বুলা বাড়ি নেই, রান্নার দরকার নেই, শুধু ভাবনায় ডুবে থাকার সুখে বসে বসে থাকে বুলার মা। বুলার মা দেয়ালে ঝোলানো ওই ঝাপসা ফটোটার দিকে তাকিয়ে মনে মনে কতো কথা বলে।

আর হঠাৎ বড়ো একটা নিশ্চিন্ততাও বোধ করে যেন।

দাদা স্বেচ্ছায় ভার নিচ্ছেন, যে কারণেই হোক, নিচ্ছেন। এবার বুলার মা হাত থেকে নৌকার দাঁড়টা টানতে পারে।

কিন্তু বুলার মার কি নিশ্চিন্ততার ভাগ্য?'

দরজায় কড়া নড়লো।

রানুদির ড্রাইভার এসে দাঁড়ালো।

বুলার মা শঙ্কিত হয়ে বলল, কী ব্যাপার?'

অনাদির দিদি পাশের বাড়িতে জল আনতে যাচ্ছিল, হঠাৎ 'দিদি, ডাক শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। অবাক হয়ে বলল, 'তুমি হরবাবুর নাতনী বুলা না?

'হ্যাঁ দিদি অনাদিদা আছে? তাকে ভীষণ দরকার।'

অনাদির দিদি থতমত খেয়ে বলে, 'ছিল তো বাড়িতে, এখন বোরোল কি না কে জানে। ওই এক খামখেয়ালী ছেলে। কদিন আগে বলল, এখানের চাকরি ছেড়ে দিয়ে নতুন চাকরি নিয়ে দুর্গাপুর যাবে। আবার কাল বলল, যাব না, এখানে একটা কাজ আছে। ছেড়ে দাও ওর কথা। তা কী বার্তা গো? বিয়ের নেমন্তন্ন করতে নাকি?'

কিন্তু বুলা তো ততক্ষণে ওদের বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

জামাটা মাথায় গলাতে গলাতে বেরিয়ে আসে অনাদি, বলে, 'চল চল পার্কে-টার্কে কোথাও বসে শুনি তোর বক্তব্য। এখানে কী মানুষে বসে?'

বুলা গম্ভীরভাবে বলে, আমাকে তাহলে মানুষ নাম থেকে বাদ দাও অনাদিদা।'

'আঃ কী আশ্চর্য, এক্ষুনি দিদি এসে পড়বে. সাত সতেরো কথা বলবে, বাবা এসে যাবে। চল চল।'

একরকম তাড়িয়েই নিয়ে যায় তাকে অনাদি। পার্কের বেঞ্চে বসে পড়ে বলে, সব আগে বল তুই ছিলি কোথায়?

'ছিলাম কোথায়? কেন? মা বলেনি?' বুলা অবাক হয়ে তাকায়।

'মাসিমা!' অনাদি একটু বিষণ্ণ হাসি হেসে বলে, 'মাসিমার কথা থাক। তুই তোর কথা নিজেই বল।'

'কেন, মা'র কি হয়েছে অনাদিদা?'

অনাদি আস্তে বলে. 'দোষও আমি দিতে পারি না, একা মানুষ. মাথাটা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠতে পারে। কে নাকি তোর শ্বশুরবাড়িতে উড়ো চিঠি দিয়েছে হ্যানো ত্যানো বদনাম দিয়ে। ভেবে দেখ মনের কী অবস্থা? ওরা যদি সত্যি ভেবে বিয়েটা ভেঙে দিত?'

বুলা এবার আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে, 'তাই তো দেবার কথা। অথচ দিল না।'

'দিল না ওরা খুব ভদ্রলোক বলে। কিন্তু কে এ-কাজ করেছে তাকে খুঁজে বার করতেই হবে। ওই জন্যে দুর্গাপুরে যাওয়া বন্ধ করলাম আজ—।'

'আজ তুমি দুর্গাপুরে যাচ্ছিলে?

'যাচ্ছিলাম তো'—অনাদি আস্তে আস্তে বলে, 'এখানের কাজটা ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছিলাম ওখানে কিছু খুঁজে পেতে নিতে।'

বুলা চোখ তুলে ওর দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলে,' 'চাকরি না পেয়েই কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছিলে?'

'ওই আর কি। যা হয় কিছু জুটে যেত। ওই কর্পোরেশনের কাজ আর ভাল লাগে না। বুঝলি? কিন্তু আমার কথা থাক বুলা, তুই তোর কথাই বল। কোথায় ছিলি দু'দিন?'

'কোথায় আবার?' বুলা তার সেই ভুরুর ভঙ্গী করে বলে, 'মা'র কর্ণধার সেই রাণুমাসির বাড়ি।'

'রাণুমাসির বাড়ি? মাসিমা রেখে এসেছিলেন?'

'তবে না তো কি আমি সাধ করে থাকতে গিয়েছিলাম?'

'আশ্চর্য!' অনাদি হেসে বলে, 'সত্যি কথাই বলিস তুই বুলা আমি একটা বুদ্ধু।' আমি তোকে বাড়িতে না দেখে ভাবলাম কোথায় বুঝি হারিয়ে গেছিস।'

বুলা হঠাৎ অনাদির হাতের ওপর একটা হাত রেখে আবেগের সুরে বলে, 'সত্যি? সত্যি তুমি ভাবতে পারলে আমি হারিয়ে গেছি? তাহলে তো হারিয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। আমি হারিয়েই যাব অনাদিদা।' তারপর একটু হেসে বলে. 'এখন অবশ্য প্রায় হারিয়েই গেছি। মাসির বাড়িতে না বলে লুকিয়ে পালিয়ে এসেছি। এখন নিশ্চয় খোঁজাখোঁজা করা হচ্ছে আমায়।'

'বুলা এটা কী ঠিক কাজ হয়েছে?'

'অকাজ হয়েছে।'

'সত্যিই এটা খুব খারাপ কাজ হয়েছে বুলা।'

বুলা আবার আকশে চোখ তুলে বলে, 'আমি যে আরো কত খারাপ কাজ করতে পারি তোমার ধারণা নেই অনাদিদা। কিন্তু তাতেও লাভ হল না।'

অনাদি ওর শেষের কথায় কান দেয় না। বলে ওঠে, 'ছোট মাসির তো গাড়ি আছে, এক্ষুণি গাড়ি নিয়ে তোদের বাড়িতে খুঁজতে আসবে, আর তুই এখানে আড্ডা মারছিস, যা যা, ছুটে চলে যা।'

'যাব বাবা যাব। সব সময়ে আর ছুটতে পারি না। একটু হাঁফ ছেড়ে বসেছি বসতে দাও। কিন্তু মা কী করেছে, তা তো তুমি বললে না অনাদিদা।'

অনাদি হঠাৎ খুব হেসে উঠে বলে, 'আর বলিস না। মাসিমার হঠাৎ ধারণা হল—ওই পাপ চিঠিটা আমিই লিখেছি, ব্যাস, সে একেবারে এই মারেন তো সেই মারেন, একেবারে ন ভবিষ্যতি। শেষপর্যন্ত মুখের ওপর বাড়ির দরজা বন্ধ। চিরকালের মত।'

'অনাদিদা!' বুলা প্রায় আর্তনাদের মত বলে ওঠে, 'এই কথা বলেছে তোমায় মা? তুমি আমার নামে—?'

'হঠাৎ সন্দেহে মানুষ কত কী-ই করে বসতে পারে বুলা। আমিও তো ওই মিথ্যে সন্দেহের বশে অজিতটাকে খতম করতে যাচ্ছিলাম।'

বুলা যে অনাদির সেই হাতটা চেপেই ধরে আছে, সেটা যেন বুলা ভুলেই গেছে, বুলার মনে পড়ছে না এটা দৃষ্টিকটু। বুলা সেই হাতটায় আবার চাপ দিয়ে বলে, একেবারে খতম? তুমি তো তাহলে সর্বনেশে লোক।'

'সে কথা কি আজ টের পেলি? হুঁ। ছেলেবেলায় ওই হুলোটা একবার খেলতে খেলতে চোট্টামি করেছিল বলে নাকে খৎ দিইয়ে দিইয়ে ওকে গাঁদা করে ছেড়েছিলাম। তা দেখলাম অজিতটা নির্দোষ এখন দেখতে হবে দোষী কে? খুঁজে বার করতে হবে আমায়

বুলা বেঞ্চে পা গুটিয়ে বসে ছিল, এখন পা দুটো ঝুলিয়ে দোলাতে দোলাতে বলে, 'তা খুঁজে পেলে কী করবে তাকে নিয়ে? একেবারে খতম?'

'আশ্চর্য নয়। খুন করে ফাঁসি যেতে হয় সেও রাজী।'

'তবেই তো ভাবনার কথা গো। সামান্য একটা উড়োচিঠির দায়ে একটা মানুষ খুন হবে, একটা মানুষ ফাঁসি যাবে। কী বিপদ।'

'তা বিপদ যদি কেউ ডেকে আনে উপায় কী?'

'এমনও তো হতে পারে তার উদ্দেশ্যটা মহৎ ছিল '

'কারুর নামে বদনাম দিয়ে উড়োচিঠি দেওয়ার মধ্যে কোনো মহৎ উদ্দেশ্য থাকতে পারে না বুলা।'

'মা ন ধর ওই থেকে কারুর কোনো উপকার হবে ভেবে—'

'ওই থেকে কারুর কোনো উপকার হতেই পারে না।'

'তবে আর কি কথা ' বুলা উদাস গলায় বলে, কিন্তু তোমাকে কেন সন্দেহ করতে গেল মা? তোমার তো কোনোরকম উদ্দেশ্যই থাকতে পারে না আমার বিয়ে ভাঙার—'

অনাদি বলে, 'ও কথা ছাড়। মানুষের কতরকম ধারণা থাকতে পারে—'

বুলা একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, 'আমার খুব আশ্চর্য লাগছে। মা কে আমি খুব অন্যমনস্ক ভাবতাম।'

অনাদি একটু অবাক হয়ে বলে, 'অন্যমনস্ক মানে?'

'মানে? তাও বোঝাতে হবে? অন্যমনস্ক মানে চোখের সামনে যা ঘটে যাচ্ছে, তার সম্পর্ক বোধ নেই। যেমন তুমি।'

অনাদি ওর দিকে সোজা তাকিয়ে বলে, 'আমার সম্পর্কেও তাহলে তোর ধারণা স্রেফ বোকার মত।'

'অনাদিদা।' বুলা আর একবার ওর হাতটা চেপে ধরে।

'বুলা বাড়ি যা।'

'বুলা একমনে পা দোলাতে দোলাতে খুব একটা সহজ কথার

মত বলে, 'না গেলে কী হয় অনাদিদা?'

'বুলা পাগলামী করিসনে—'

'আচ্ছা অনাদিদা, জীবনে একবার এক দিনের জন্যেও পাগলাম করা যায় না?

'বুলা আমি বলছি তুমি বাড়ি যাও।'

বুলা তবু ওঠে না। বলে, 'আমায় তুমি বকছ?'

'বকার মত কাজ করলে বকতেই হবে।'

'বেশ বকুনিই খাব। যত ইচ্ছে বকো, আমি তোমার সঙ্গে দুর্গাপুর যাব।'

'আমার সঙ্গে দুর্গাপুর যাবি!'

'তাই তো ভাবছি—'

'কিন্তু এখন কোথায় দুর্গাপুর? এখন তোদের সেই শত্রুটাকে খুঁজে বার করে তবে আমার অন্য কাজ।'

বুলা আবার পা দোলাতে দোলাতে অল্প অল্প হাসে। বুলার প্রসাধন-রঞ্জিত মুখে পড়ন্ত সূর্যের আলো এসে পড়ে বুলাকে চতুর্গুণ উজ্জ্বল দেখায়।

বুলা সেই অল্প হাসির মুখে বলে, 'তুমি যে সাংঘাতিক ভয় দেখিয়ে রেখেছ, পেলে একেবারে খতম করে দেবে। নইলে তোমার শত্রু ধরে দিতাম।'

শুনে অনাদি চমকে ওঠে, 'কী বললি? জানিস তুই, কে এ কাণ্ড করেছে?'

বুলা ঘাড় কাৎ করে।

'সত্যি বলছিস? বল্ তো কে! ওই দুলালটা?

'না!'

'তবে? বিজয়? নগেন? রবি?'

'আরে না না! ওদের কী দরকার?'

'ওদেরই তো দরকার। ওরাই তো ষড়যন্ত্র করেছিল তোকে

মিথ্যে করে কিছু বলে ভুলিয়ে-ভালিয়ে বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে গিয়ে একজনের হাতে তুলে দেবে।'

'চমৎকার! অপূর্ব! খুব ভাল ভাল বন্ধু তো তোমার?' তারপর হেসে উঠে বলে, 'সত্যি, তোমার বন্ধু ভাগ্যই দেখছি এমনি—কেউ বা মেয়ে লুঠ করার ফন্দী আঁটে, কেউ বা বিয়ের ভাঙচি দিতে উড়োচিঠি পাঠায়। কিন্তু বললে যে আর একজনের হাতে তুলে দেবার মতলবে, তা সেই জনটি কে?'

'সে কেউ নয়! একটা বাজে লোক। যমন বাজে বুদ্ধি। কিন্তু তুমি সেই নামটা বল। নির্ভয়েই বল। কথা দিচ্ছি খতম-টতম করব না।'

'ঠিক?'

'ঠিক!'

'আমার গা ছুঁয়ে বল।'

'বাবা বাবা! এই ছুঁলাম। অনাদি বোস কখনো কথা দিয়ে কথার খেলাপ করে না, বুঝলি? কে তোর এত স্নেহ পাত্র তা তো জানি না, তাই তাকে বাঁচাবার জন্যে—'

'তাকে বাঁচাবার জন্যেই তো এত কাণ্ড অনাদিদা—'

বুলা ঘাড়টা একটু ফিরিয়ে বলে, 'অভয় যখন দিয়েছ, নির্ভয়েই বলি. শত্রু তোমার সামনেই বসে। তোমার হাতের মুঠোয়।'

শত্রু হাতের মুঠোয় ছিল না, অনাদিই তাব শত্রুর হাতের মুঠোয় ছিল। অনাদি সেই মুঠো প্রায় ঝেড়ে ফেলে দাঁড়িয়ে উঠে রুদ্ধ কণ্ঠে বলে ওঠে, 'কী বললি!'

বুলারও গলা বুজে এসেছে, বুলা সেই বোজা গলায় বলে, 'কেউ কোনোখানে সহায় নেই, নিরুপায় হয়ে সমুদ্রে তৃণখণ্ড ধরতে গিয়েছিলাম অনাদিদা। কিন্তু কাজে লাগল না। কূলে উঠতে পারা গেল না। কিন্তু বাঁচাতে তো হবে? তাই হারিয়ে যেতে এলাম।'

অনাদি আবার বসে পড়ে বলে, 'এমন সর্বনাশা বুদ্ধি করিস না

বুলা। যা হচ্ছে, তা ভালই হবে তোর পক্ষে—'

'কে বলেছে তোমায়?'

'সবাই এই কথাই বলবে বুলা।'

বুলা তেমনি ঘাড় ফিরিয়ে বলে, 'সবাই যে কথা বলবে সেই কথ'টা ছাড়া আর কোনো কথা তোমার জানা নেই?'

'বুলা তুমি এখনো ছেলেমানুষ আছ, এখনো পৃথিবীকে দেখনি—'

'পৃথিবীকে হয়তো দেখিনি অনাদিদা, বুলা আস্তে বলে, 'নিজেকে তো দেখেছি।'

'অনাদি একটু চুপ করে থেকে গভীর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলে, ''কল্প মাসিমা একেবারে ভেঙে পড়বেন বুলা।'

বুলা তেমনি আস্তে বলে, 'সেই কথা ভেবে ভেবেই তো এতটা এলোমেলো করে বললাম অনাদিদা। অনবরত চিন্তার যুদ্ধ চালিয়েছি, মাকে ভাঙব, না মেয়েকে ভাঙব। শেষপর্যন্ত আত্মস্বার্থেরই জয় হল, নিজেকে ভাঙতে পারলাম না।'

'এখন কী করবি?'

'এখন?' বুলা হঠাৎ একমুখ হেসে উঠে বলে, 'এখন তোমাকে আমাকে ঝালমুড়ি খাব। ওই যাচ্ছে মুড়িওলা। ও মুড়িওলা—'

অনাদি হতাশ গলায় বলে, 'আমার সন্দেহ হচ্ছে তোর মাথায় দোষ ঘটেছে।'

'তা ঘটতে পারে। তাহলে তো সুবিধেই। পাগলের সাত খুন মাপ।...এই—এই মুড়িওলা—'

মুড়িওলা এলে বুলা দু'ঠোঙা ঝালমুড়ি কিনে একটা অনাদির হাতে ধরিয়ে দিয়ে আর একটা নিজে নিয়ে বলে, 'খাও।'

'বুলা, রাজ্যের লোক আমাদের দিকে তাকাচ্ছে।'

'তাকাক না। ভগবান চোখ দিয়েছেন, দ্রষ্টব্য জিনিস দেখবে না?'

'বুলা কাজটা খুব অসমসাহসিক হচ্ছে।'

'হচ্ছে তো? খুব ভাল। চিরকাল কে
াৎ মনে হল, ওই ভয়টাকে ত্যাগ করলে কে
খি।'

অনাদি এই বেপরোয়া মুখের দিকে তাকি
লা, তোমার মা বলেছেন পায়ে মাথায় ক
ামিও সে-কথা বলি—'

'বলে বুঝি? কিন্তু ওই পা মাথার হিসে
ন তো? টাকাকড়ি ঘরবাড়ি শাড়িচুড়ি—
গুলো বাদ দিলে, তাহলে আপদ চুকে যায়?
থিবীর যে কোনো একটা কোণে হারিয়ে গি

'বুলা, একটা আবেগের মাথায় কিছু
াবতে সময় নাও।'

'সময় নিয়ে নিয়ে হাঁপিয়ে উঠেছি অনাদিদা,
াই।'

ওরা অনেকক্ষণ বসে থাকে

আস্তে আস্তে অন্ধকার নেমে আসে। এ
া, তোমার আদেশই মাথা পেতে নিলাম।
করবে?'

'এখন? এখন মার সামনে গিয়ে দাঁড়াব.
বলব, এছাড়া আর কোনো উপায় খুঁজে পাই
চাও করে বসেছিলাম মা।'

'কিন্তু বুলা, মাসিমা এ শুনলে মারা যাবে,

'তবুও উপায় নেই অনাদিদা। বললাম
ভেবে ভেবেই দিশেহারা হয়ে মরছিলাম,
দাঁড়ালে, মাসিমা সোনার খাঁচায় বাস করে

আর বুঝতে শিখলাম বাস্তবকে সহ্য করবার ক্ষমতা

মৃত্যুকে ঠেকাবার ক্ষমতা কারো নেই। মা যদি শুধু

পরা আর দামী গাড়ি চড়াটাকেই মেয়ের পরম সুখ

আমি নাচার। দুঃখ তাঁকে পেতেই হবে। তবু আমি

র মত আবেগে ভেসে যাইনি অনাদিদা; আমি ওই

ায় মা আর মেয়ে দুজনকেই চাঁপিয়ে দেখেছি কার

তারপর আমি আমার কর্তব্য ঠিক করেছি।'

ও বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি এসে গেল। উঠেই পড়তে হল

'চল, আমায় পৌঁছে দেবে।'

আমার তো ও বাড়িতে ঢোকা বারণ।'

চাতে প্রায় ছুটে শুরু করে বললে, 'সে তোমার

ার সঙ্গে গেলে—'

তুমি একাই যাও বুলা। আজ তোমার সঙ্গে আমায়

[illegible] করতে পারবেন না।...মাসিমার কথা দূরে থাক,

ছি না সহ্য করতে। এখনো বলছি বুলা, এ অনুরোধ

ায়—

নে?

দোকানের শেডের নীচে দাঁড়িয়ে পড়ে অনাদিকেও

র বললে, 'অনুরোধ মানে? বল আদেশ। আমি

এখন থেকে আমার বোঝাটি মাথায় বয়ে বেড়াতে

হাড়ান নেই।'

তুমি পারবে একটা মিস্ত্রীর ছেলের বোঝা

হাজারবার।'